দুই

দীনবন্ধু পূর্ব বাংলা নাটক ও বঙ্গরঙ্গমঞ্চের অবস্থা

॥ ১ ॥

নবজাগ্রত বাংলাদেশে আধুনিক বাংলা নাট্যচর্চার দ্বারোদ্ঘাটন যিনি করলেন, তিনি রুশদেশীয় একজন বিদেশী। নাম গেরাসিম স্টেপানোভিচ লেবেডেফ (১৭৪৯-১৮১৭, ১৫ই জুলাই) জন্ম জারশাসিত রাশিয়ার ইউক্রেনের এক কৃষক পরিবারে। কলকাতায় সর্বপ্রথম বঙ্গরঙ্গমঞ্চ (Bengally Theatre) প্রতিষ্ঠা ও ঐ মঞ্চে বাংলা নাটকাভিনয়ের বরমাল্য তাঁরই প্রাপ্য। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে লেবেডেফের এই কৃতিত্বের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, "the first attempt at writing a drama entirely in the European style and produced with all the paraphernalia of the European stage were made by a foreigner —a Russian—who came to India and lived there as an adventuring musician and artist from Russia."[১] লেবেডেফ বাংলাদেশে, বিশেষতঃ কলকাতায়, নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে একটা গভীর প্রেরণা সঞ্চার করেছিলেন একথা সত্য। কিন্তু লেবেডেফের কলকাতা আগমনের (১৭৮৭) পূর্বেই এদেশে বসবাসকারী ইংরেজদের চিত্তবিনোদনের জন্য প্রতিষ্ঠিত দু'তিনটি নাট্যালয়ের কথা জানা যায়। এই রঙ্গমঞ্চগুলিতে ইংরেজী নাটকই অভিনীত হত। অভিনেতাগণও ছিলেন ইংরেজ। তবুও এই নাট্যালয়গুলি এদেশের নাট্যরুচি ও নাটৌৎসুক্য সৃষ্টিতে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে যে কিছু প্রভাব বিস্তার করেছিল, একথা একেবারে অস্বীকার করা যায় না। এই রঙ্গমঞ্চগুলিতে যদিও দর্শকগণের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন ইংরেজ কিন্তু কোন কোন রাজা মহারাজা প্রমুখ সম্ভ্রান্ত বাঙালীও এইসব রঙ্গমঞ্চের অভিনয় দর্শনে প্রবেশাধিকার পেতেন। রাজপুরুষ-গণের চিত্ত বিনোদনের উদ্দেশ্যে এই রঙ্গমঞ্চগুলিতে প্রায়শঃই যে অভিনয় ব্যবস্থা হত, কালক্রমে 'এই ইংরেজ সম্প্রদায়ের মত আমোদ-প্রমোদে'র উদ্দেশ্যে ইংরেজদের মত 'শেয়ার' গ্রহণ করিয়া একটি বঙ্গীয় নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা বাঙালী সুধীজন গভীর-ভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন। সুতরাং বাংলা নাটক ও বঙ্গরঙ্গমঞ্চের ইতিহাস আলোচনার ক্ষেত্রে এই রঙ্গালয়গুলির পরিচয় গ্রহণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে।

প্রথমতঃ, ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এদেশে ইংরেজের আগমন ঘটলেও ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজদ্দৌলার পতন ও ক্লাইভের জয়লাভের পর তারা এদেশের রাজনীতির

অভিনীত হত, অনুমান করা যায়, সেগুলি ফরাসী নাটকই ছিল। সুতরাং কলকাতার জনচিত্তে গৌরহাটি রঙ্গমঞ্চের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন প্রভাব পড়েছিল বলে মনে হয় না।

'ওল্ড প্লে হাউসে'র দীর্ঘ উনিশ বছর পর কলকাতায় ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত দ্বিতীয় রঙ্গমঞ্চ 'নিউ প্লে হাউস' বা 'ক্যালকাটা থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে রাইটার্স বিল্ডিং-এর পেছনে লায়ন্স রেঞ্জের উত্তর পশ্চিম কোণে[৬] নতুন চীনাবাজারে।[৭] রঙ্গমঞ্চটি প্রতিষ্ঠার জন্য 'শেয়ার ভিত্তিক' চাঁদা তোলা হয়েছিল। এর জন্য ব্যয় হয়েছিল প্রায় এক লক্ষ টাকা[৮] 'ক্যালকাটা থিয়েটারে'র অধ্যক্ষতা করবার জন্য প্রখ্যাত ইংরেজ অভিনেতা ডেভিড গ্যারিক রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষের দ্বারা অনুরুদ্ধ হলে তিনি বার্ণার্ড মেসিঙ্ককে কলকাতায় পাঠান। অভিনয় কুশলতার জন্য রঙ্গালয়টি তখন সকলের প্রশংসা অর্জন করেছিল।[৯] এমনকি এই রঙ্গালয়টির সঙ্গে অনেকে ইয়োরোপীয় রঙ্গালয়ের সাদৃশ্য কল্পনাও করেছেন।[১০] প্রবেশ মূল্যের মহার্ঘতা[১১] সত্ত্বেও দর্শকের অভাব হত না। এমনকি কখনও কখনও টিকিট না পেয়ে দর্শকদের অনেককে নিরাশ হয়ে ফিরে যেতেও হত। শেক্সপীয়ার, বেনজনসন, সেরিডন প্রভৃতি নাট্যকারের ইংরেজী নাটক ছাড়াও এখানে দেশীয় নাটকের ইংরেজী অভিনয়ের কথাও জানা যায়। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে এই রঙ্গালয়ে কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম' নাটকের ইংরেজী অনুবাদ 'The Indian Drama of Sakuntala or the Fatal Ring" অভিনীত হয়েছিল। শুধু ভারতীয় নাটকই নয়, ইয়োরোপীয় বিভিন্ন ভাষার অনূদিত নাটকও এখানে অভিনীত হয়েছে। উল্লিখিত বিবরণ থেকে এসত্যই স্পষ্ট হয় যে, নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে 'ক্যালকাটা থিয়েটার' যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছিল। উপযুক্ত চর্চা ও নিষ্ঠার দ্বারা উদ্যোক্তাগণ অভিনয়ের মানোন্নয়নে ব্রতী হয়েছিলেন।

'ক্যালকাটা থিয়েটারে'র সময় পর্যন্ত ইংরেজী নাট্যমঞ্চে অভিনয় ব্যবস্থার একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এই রঙ্গমঞ্চগুলিতে নাটকীয় পাত্র-পাত্রী সকলেই ছিলেন পুরুষ। 'স্ত্রী' চরিত্রে পুরুষেরাই অভিনয় করতেন। কোন পেশাদারী অভিনেতাকেও প্রথম দিকে এই রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করতে দেওয়া হত না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোর্ট অব ডিরেক্টরস্, এমন অভিনয় ব্যবস্থাই তখন সাব্যস্ত করেছিলেন। 'স্ত্রী' চরিত্রে মহিলাগণের অভিনয়কে সামাজিক, নৈতিক ও মানসিক প্রভৃতি সকল দিক থেকেই আপত্তিজনক বলে মনে করেছিলেন। কোর্ট অব ডিরেক্টরস্-এর মনোভাবের স্বরূপ উদ্ঘাটন প্রসঙ্গে ডগলাস ড্যায়ার্স বলেছেন,—

"The Court of Directors···feared that handsome actresses in India might rouse spirit of intrigue among the junior servants of

the company ; and doubtless in those days when English women were so scarce, the advent of actresses would have created a great stir and possibly have led to scandal."[১২]

বস্তুতঃ, কলকাতায় ইংরেজী নাটকে মহিলা অভিনেত্রীর আগমন মিসেস ব্রিস্টোর প্রতিষ্ঠিত 'চৌরঙ্গী থিয়েটারে'র আগে ঘটেনি। 'স্ত্রী' চরিত্রে পুরুষগণের অভিনয়ে নাট্যোৎকর্ষের যে কোন কমতি ছিল না তা সমসাময়িক বিভিন্ন মন্তব্য থেকেই জানা যায়।[১৩]

কলকাতার ইংরেজ নরনারীকে দীর্ঘকাল বহু উজ্জ্বল সন্ধ্যা উপহার দিয়েছিল এই 'ক্যালকাটা থিয়েটার'। কিন্তু কালক্রমে দেখা দিল অর্থাভাব। ঋণজালে জড়িয়ে পড়তে হল এই নাট্যালয়কে। তবু কর্তৃপক্ষ তাঁদের প্রিয় এই প্রতিষ্ঠানটিকে টিকিয়ে রাখবার জন্য নানা ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন। একদা যে কোর্ট অব ডিরেক্টরস্ রঙ্গমঞ্চে মহিলা অভিনেত্রীর বিরোধী ছিলেন, সেই নৈষ্ঠিকতাও প্রয়োজনের তাগিদে অটুট রইল না। পেশাদারী অভিনেতাদের সঙ্গে এই রঙ্গমঞ্চে মিসেস ক্রুসিফিক্স, মিসেস হিউজেস প্রভৃতি অভিনেত্রীরা কয়েক বছরের মধ্যেই এসে যোগ দিয়েছিলেন এই মঞ্চের পুনরুজ্জীবনের আশায়। কিন্তু দুর্দশা যখন একবার দেখা দেয় তখন তাকে সহজে আর প্রতিহত করা যায় না। 'ক্যালকাটা থিয়েটারে'র দীপ্তি ম্লান হয়ে যেতে বসেছিল মিসেস্ ব্রিস্টোর 'চৌরঙ্গী প্রাইভেট থিয়েটারে'র পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে।

১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে লেবেডেফের 'বেঙ্গলী থিয়েটার' এবং ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দের 'হোয়েলার প্লেস থিয়েটার'-ও 'ক্যালকাটা থিয়েটারের' কাছে কম প্রতিবন্ধক ছিল না। ইংরেজদের বিরোধিতায় রুশ লেবেডেফ তাঁর থিয়েটার বন্ধ করতে বাধ্য হলেন। অভিনয়-ব্যর্থতায় 'হোয়েলার প্লেস থিয়েটারে'র আলোও নিভে গেল। কিন্তু 'ক্যালকাটা থিয়েটারে'র সুদিন আর ফিরে এল না। তবু শেষ চেষ্টা করেছিলেন কর্তৃপক্ষ, ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী নাট্যকার মলিয়েরের 'দি চিটস্ অব ক্যাঁপা' নাটকটির অভিনয় ব্যবস্থা করে। সে চেষ্টাও ব্যর্থ হল। ঋণের বোঝা আর না বাড়িয়ে কর্তৃপক্ষ স্থির করলেন—'the theatre must be sold off.'

দীর্ঘকাল যাবৎ 'ক্যালকাটা থিয়েটার' অভিনয় ব্যাপারে ছিল এক ও অদ্বিতীয় কিন্তু যখন থেকে পাশাপাশি আর একটি নাট্যালয় গড়ে উঠল এবং নৃত্যপটিয়সী অসামান্যা সুন্দরী রূপসী মিসেস ব্রিস্টোর মত রমণী তার কর্ণধার হলেন তখন থেকেই ইংরেজ দর্শকের কাছে 'ক্যালকাটা থিয়েটার' সমস্ত আকর্ষণ হারাতে বসল, একথা সহজেই অনুমান করা যায়।

সুন্দর কাব্যের কোন্ কোন্ গান লওয়া হইয়াছিল এবং কোথায় ঐগুলি প্রযুক্ত হইয়াছিল তাহা সঠিক ভাবে নির্ধারণ করিবার কোন উপায় নাই।"[২৫]

ফরাসী নাট্যকার মলিয়ের রচিত 'L' Amour Le Medicine'-র ইংরেজী অনুবাদ 'Love is the Best Doctor'-ই লেবেডেফের অনূদিত দ্বিতীয় নাটক। লেবেডেফের[২৬] এই অনুবাদটির কিন্তু এখনও কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। নাটক দুটির অনুবাদ প্রসঙ্গে লেবেডেফ বাঙালী জনগণের রুচি ও সংস্কার সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন, এ প্রসঙ্গে তার কিছু আলোচনা প্রাসঙ্গিক বলে মনে করি। লেবেডেফ বলেছেন—"...and having observed that the Indians preferred mimicry and drollery to plain grave solid sense, however purely expressed—I therefore fixed on those plays, and which were most pleasantly filled up with a group of watchman, chokey-dars ; savoyards, canera, thieves, ghoonia, lawyers, gumosta and amongst the rest a corps of petty plunderers."[২৭] লেবেডেফের উক্ত মনোভাবের প্রতি অনেকেরই দৃষ্টি কমবেশী আকৃষ্ট হয়েছিল নিশ্চয়ই। ডঃ অরুণ সান্যাল তাঁর আলোচনায় লেবেডেফের এই দুটি নাটকের অনুবাদের যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে মন্তব্য করে বলেছেন,—

> "সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকের ইউরোপীয় কমেডি নাটকগুলি ছিল সাধারণত চক্রান্তমূলক আর তৎকালীন বাঙ্গালী বাবু সমাজের প্রণয়রঙ্গও ছিল এই জাতীয় চক্রান্তের পরিপোষক। লোকচরিত্রে-অভিজ্ঞ লেবেডেফ তাঁর দর্শকের কথা বিবেচনা করেই ভাবকল্পনামূলক সমুন্নত প্রেমের আদর্শলোক যে কমেডিতে রচিত হয়, সেই কমেডি কাহিনীকে গ্রহণ না করে দর্শক সমাজের ব্যবহারিক জীবনযাত্রার সঙ্গে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিচয়মূলক, অপেক্ষাকৃত স্থূল দেহজ প্রেমের কাহিনীকেই গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নির্বাচিত দুটি বিদেশী নাটকই —'The Disguise' এবং 'Love is the Best Doctor' চক্রান্তমূলক প্রণয়রঙ্গ, যা বিশেষ ভাবেই ধনী ও মধ্যবিত্ত বাবু সমাজের পক্ষে ছিল রুচিকর ; কেননা নাটক নির্বাচনে দর্শক রুচির কথা বিবেচনা অপরিহার্য।"[২৮]

'The Disguise' নাটকের নির্বাচন ও অনুবাদ প্রসঙ্গে ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ভিন্নমত পোষণ করেন। মাদ্রাজ অবস্থানকালীন নাট্যকার পল জড্রেলের অনুজ ডাঃ জড্রেলের সঙ্গে লেবেডেফের পরিচয় সম্ভাবনার উপর গুরুত্ব আরোপ করে তিনি অনুমান করেছেন "এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে লেবেডেফ ডাঃ জড্রেলের নিকট হইতেই তাঁহার অগ্রজের নাটকের সন্ধান পাইয়াছিলেন।"[২৯]

লেবেডেফ যে কমেডি দুটি অনুবাদ করেছিলেন, সে নাটক দুটি খুব উচ্চস্তরের নয়। 'The Disguise' নাটকটিও অতি সাধারণ স্তরের। তার উপর জনমনোরঞ্জনের জন্য চটুলরসের উপযোগী কিছু রসদ সরবরাহ করে নাটকীয়তাকে অনেকক্ষেত্রে নষ্ট করে ফেলেছিলেন। লেবেডেফের এ-দুটি নাটকের অনুবাদ ও এর মধ্যে লঘু-তরল রস পরিবেশন প্রবণতার সমর্থনে ডঃ দাশগুপ্ত বলেছেন, "বাঙ্গালীর রুচি উন্নত করা লেবেডেফের উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল নাটক দেখার রুচি সৃষ্টি করা।"[৩০] স্বীকার না করে উপায় নেই যে, ডঃ দাশগুপ্তের মন্তব্যের দ্বিতীয়াংশ তাঁর অনুমান মাত্র। কেননা, লেবেডেফের দীর্ঘ প্রতিবেদনে উক্ত মতের সমর্থনে কোন কথাই পাওয়া যাবে না যাতে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, লেবেডেফ বাঙালীর নাটক দেখার রুচি তৈরী করবার চেষ্টা করেছিলেন। যদি লেবেডেফের উদ্দেশ্য অমন মহৎই হত তাহলে তিনি কর্দমাক্ত বেনো জলে গা না ভাসিয়ে ভাল নাটকও নির্বাচন করতে পারতেন। সে প্রসঙ্গে প্রবেশ করবার আগে লেবেডেফ-গবেষকের মতামতটি জেনে নেওয়া যেতে পারে। ডঃ সান্যাল এ-প্রসঙ্গে লেবেডেফের বাঙালী-প্রীতিকেই আবিষ্কার করবার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর মতে, "লোক চরিত্রে অভিজ্ঞ গেরাসিম স্টেপানোভিচ লেবেডেফ কমেডির এই বৈশিষ্ট্য ('কমেডি যেমন সমাজ জীবনকে চিত্রিত করে, তেমনি লোকশিক্ষাও দান করে') সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন বলেই তিনি নির্দ্বিধায় 'কমেডি'কেই নির্বাচন করেছিলেন তৎকালীন বাঙালী দর্শক সমাজের জন্য। বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতিকে বিশেষভাবে ভালবেসেছিলেন বলেই জাতীয় জীবনের সমুজ্জ্বল সম্ভাবনার পথে বাধাস্বরূপ এই জাতির চারিত্রিক ত্রুটি-বিচ্যুতি ও উচ্ছৃঙ্খলতা দূরীকরণে প্রয়াসী হয়েই তৎকালীন রুচিকে গ্রহণ করে তাকে সমুন্নত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।"[৩১] উক্ত গবেষকের সুচিন্তিত বক্তব্যের বিশ্লেষণের আগে লেবেডেফের অনূদিত নাটকটির পরিচয় গ্রহণ করা যাক। 'কাল্পনিক *সংবদল*' সম্পাদক ডঃ *মদনমোহন গোস্বামী* '*নাট্যালোচনা*' প্রসঙ্গে লিখেছেন,

> "নাটকটি অতি সাধারণ স্তরের। কোন নূতন চিন্তা, মানবজীবনের কোন বিচিত্র সমস্যা কিংবা কোন আকস্মিকতার দীপ্তি ইহার মধ্যে পাওয়া যায় না। নিতান্ত সাধারণ একটি ভ্রান্তিবিলাসকে কেন্দ্র করিয়া ইহা গড়িয়া উঠিয়াছে। নাট্য-সাহিত্যে ভ্রান্তিবিলাস নূতন নহে, তবে দৃষ্টিপাত ও পরিবেশনের নূতনত্বে ইহা উপাদেয় হইয়া উঠে। বর্তমান ক্ষেত্রে এই নূতনত্বের একান্ত অভাব দেখা যায়। বহু ক্ষেত্রে নাটকের পরিস্থিতি সম্ভাব্যের সীমারেখাকে অতিক্রম করিয়া যায় নাই, এমন কথা নহে। রমন্যাস-রসে নাটকের প্রতিটি পাত্র-পাত্রী এমনই অভিষিক্ত হইয়াছে যে, কঠিন বাস্তবও সেখানে নিঃশেষে অবলুপ্ত

হইয়া গিয়াছে।...বঙ্গানুবাদে কোন কোন চরিত্রকে রাজপুত জাতীয় করিবা
চেষ্টা থাকিলেও বলা বাহুল্য এই চেষ্টা আদৌ ফলবতী হয় নাই। নাটকটির ম
বীরত্বের অবকাশ না থাকিলেও কিঞ্চিৎ ব্যর্থ ফণা আস্ফালন রহিয়াছে।
মনোরঞ্জনের দিকে লেবেডেফের লক্ষ্য ছিল; তাই বোধহয় নাটক-নির্বাচ
তিনি লঘুচরিত্রের উপর কিছু বেশী পক্ষপাত দেখাইয়া থাকিবেন। কিন্তু
লঘু-রস বিতরণেও মাত্রাধিক্য ঘটিয়াছে।...অত্যধিক এই লঘুতার জ
নাটকটি রসোত্তীর্ণ হয় নাই। বিদ্যাসুন্দর কাব্যের গান লাগাইয়া নাটক
যে রমণীয় হইয়া উঠিয়াছিল এমন কথা মনে করা যায় না। রচনা যেমা
দুর্বল, অভিনয়-কৌশলে তাহাকে সম্পূর্ণাংশে সবল করা যায় না। গতি হ
নাটকের প্রাণ। বর্তমান নাটকে ইহা একেবারে অনুপস্থিত না থাকিলে
নাট্যবিধৃত একাধিক সুদীর্ঘ সংলাপের দ্বারা পদে পদে খণ্ডিত হইয়া
শ্লথগতি এই নাটকটি তখনকার দিনে কিভাবে দর্শক সাধারণের চিত্তবিনো
করিয়াছিল তাহা আজ ভাবিতেও আশ্চর্য লাগে। সত্যই মনে হয় 'অ
কুনাট্যরঙ্গে' রাঢ়ে-বঙ্গে লোক মজিয়াছিল। মঞ্চশিল্পের দিক দিয়া
দেশ যথার্থই পশ্চাৎপদ ছিল।"৩২

নাটক হিসেবে 'কাল্পনিক সংবদলে'র সর্বাঙ্গীণ ব্যর্থতার চিত্রটি যথাযথভাবে তুলে ধ
ডঃ গোস্বামী। লঘু-গুরু বিভিন্ন প্রকারের যাত্রাভিনয়ের সঙ্গেই সমকালীন বাঙালী প
ছিল সুতরাং নাটক-বিষয়ে তাদের নিছক অজ্ঞতাকে এ প্রসঙ্গে যুক্তি হিসেবে গ্রহণ
বলে মনে হয় না। তাহলে জনরুচির দোহাই দিয়ে লেবেডেফ যে নাটক
করেছিলেন তার যৌক্তিকতা কোথায়? ডঃ গোস্বামী এ প্রশ্নের মীমাংসায় গভীরে
করেননি। বিকৃত জনরুচির (?) পক্ষপাতিত্বই করেছিলেন লেবেডেফ। ডঃ গো
মতে, "এ দেশে থাকিয়া তিনি জনরুচি সম্বন্ধে যাহা বুঝিয়াছিলেন, তাহাই
করিয়া নাটক নির্বাচন ও অনুবাদ করিয়াছিলেন। আজ শতাধিক বৎসর
পড়িয়া ত্রুটিসমূহের যে তীক্ষ্ণতা অনুভূত হইতেছে, তৎকালে সম্ভবতঃ তাহা সহজ
ছিল।...আজ রুচি পরিবর্তিত হইয়াছে, চিন্তার বিবর্তন ঘটিয়াছে, তাই সেকালে
অভিনন্দিত নাটক আজ যাদুঘরের সামগ্রী ছাড়া অপর কিছুই নহে।"৩৩

লেবেডেফের প্রতিবেদনে 'ইণ্ডিয়ানস্' অর্থে বিশেষভাবে বাঙালীদেরই সূচিত
হয়েছিল নিশ্চয়ই। তারা বিশুদ্ধ তত্ত্বকথা বা গভীরতার (গম্ভীর বাস্তব বুদ্ধি
চাইতে ভাঁড়ামি (mimicry) এবং ঠাট্টা-তামাসা (drollery) পছন্দ করে।
রুচি-প্রকৃতি সম্পর্কে এই মতের সর্বাঙ্গীণ সত্যতা মেনে নেওয়া যায় না।

এক পাক্ষিক তেমনি অ-স্বচ্ছ দৃষ্টিপ্রসূত বলে মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে বলে মনে করি। বিষয়টি আলোচনাসাপেক্ষ। বিচার প্রয়োজন, এই চটুলতা, যা লেবেডেফ 'ইণ্ডিয়ানস্'দের মধ্যে লক্ষ্য করেছেন, তা কি সবজনীন বাঙালীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, নাকি বিশেষ একটি যুগের কিছু মানুষের মানস প্রবণতা।

লেবেডেফের জীবনী পাঠে জানা যায় যে, তিনি সঙ্গীত শিল্পী ছিলেন এবং ভাগ্যান্বেষণে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে কলকাতায় এসে পৌছান। এদেশে এসেই তিনি দেশীয় ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আগ্রহে স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও শাস্ত্রাদির আলোচনায় আত্মনিয়োগ করেন। সমকালে বাংলাদেশে প্রচলিত 'যাত্রা'র সঙ্গে এই সঙ্গীত রসিক ও দেশীয় সংস্কৃতির পরিচয় লাভাগী লেবেডেফের যোগাযোগ হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই কলকাতা এবং তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে যে জটিলতা লাভ করেছিল, সমকালীন যাত্রাগানের আসরে, কবিতায় এবং নক্সায় এই সমাজ এবং শ্রেণীবিশেষের বাঙ্‌চিত্র জনসাধারণের চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হত। আর একইভাবে পরিবর্তিত সামাজিক পরিমণ্ডলে উদ্ভূত কবি, তর্জা, আখড়াই, হাফ আখড়াই, ঝুমুর ইত্যাদি গানের মধ্যে হাল্কা রসিকতা এবং স্থান বিশেষে অশ্লীলতা লেবেডেফের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। কিন্তু এটাই বাঙালী চরিত্রের একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। বাংলা নাটকের সৃষ্টি বা ক্রমবিকাশও এই রসরুচির অনুবর্তী নয়। অধ্যাপক মন্মথমোহন বসু তাঁর 'বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। প্রসঙ্গ-ক্রমে তিনি বলেন, "আসল কথা এই যে, জনসাধারণ চিরকালই রঙ্গ-ব্যঙ্গ ভালবাসে এবং সেইজন্যই ভোজের সঙ্গে চাট্‌নীর মত নাট্যাভিনয়ের মধ্যে এরূপ রঙ্গরসের পরিবেশন একটা প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এ রসকে অতিমাত্রায় প্রাধান্য দেওয়া যে বাঞ্ছনীয় নয় তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।"৩৪ এ বৈশিষ্ট্য শুধু এ দেশেই নয়, পাশ্চাত্য দেশেও এর পরিচয় পাওয়া যাবে। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের বড় বড় নাট্যশালায় বহু ব্যয়ে ইটালীয় গায়ক ও ফরাসী নর্তকগণকে পোষণ করতে হত শুধুমাত্র দর্শকদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে। শেরিডানের দেড়শ' বছর পরেও, যখন ইংরেজী নাটক ও দর্শকের শিক্ষার মান যথেষ্ট উন্নত হয়েছে, তখনও এই চটুলতা ও তামাসার প্রাবল্য লক্ষ্য করে James Ralph দুঃখ করে বলেছেন,

"Such is the depravity of human nature, that if we are not pleased, we will not be instructed; therefore all the additional ornaments to stage-entertainments are highly necessary to entice

us in, else we should never sit out a tedious lecture of morality.··· The generality of mankind are...in a state of in fancy the greatest part of their lives."

প্রতিটি মানুষের মধ্যেই যে একটি শিশুমন থাকে (যা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হওয়ার নয়) তারই প্রয়োজনে মাঝে মাঝে আমরা আমোদ-প্রমোদাভিলাষী হয়ে উঠি। জীবন শুধু ভাব-গভীরতারই অধীন নয়। মানবমন যেমন গভীর রহস্যের অতলান্ত অন্বেষণপ্রয়াসী তেমনি অবাধ কল্পনার রঙীন মায়াজাল বিস্তার করতেও কম উৎসাহী নয়। সুতরাং নিছক তত্ত্ব ও উপদেশ আমাদের ভাল লাগে না, তাকে রসায়িত করতে পারলেই আমরা খুশী হই। রঙ্গালয়ে, যেখানে সর্বস্তরের মানুষ একত্র বসে অভিনয় দেখে সেখানে এই রসের (এই রস মূল নাটকের স্থায়ী রস বা ফলশ্রুতি নয় অবশ্যই) যোগান দিতে হয়। "কিন্তু সুখের বিষয়, সেই শিশুসুলভ মনের তলায় থাকে ভাবগ্রাহী ও চিন্তাশীল আর একটা মন—সে যে রসপ্রার্থী তাহা প্যাণ্টোমাইমওয়ালারা দিতে পারে না—পারে কেবল রসজ্ঞ, ভাবুক ও মননশীল মহাজনেরা। শ্রেষ্ঠ নাট্যকারেরা এই রূপ মহাজন। সুতরাং রঙ্গালয়ে তাঁহাদের প্রভাব কোন কালেই বিলোপ হইবার সম্ভাবনা নাই।···উচ্চশ্রেণীর নাটকের লেখকগণ রঙ্গালয়ে হাস্যকৌতুকময় তরল রঙ্গনাট্যের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া হতাশ হইবার বা সেগুলি উপভোগ করিতে লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই।"[৩৫]

অতএব লেবেডেফ 'Indian' দর্শকদের নাট্যরুচি সম্পর্কে যে 'ঐতিহাসিক' মন্তব্য করেছেন তা শুধু এতদ্দেশীয় দর্শকগণের সাধারণ বৈশিষ্ট্য বলে ধরে নেওয়ার কোন কারণ নেই। যে দেশের লোক 'নিমাই সন্ন্যাস', 'বিল্বমঙ্গল', 'প্রহ্লাদ চরিত্র' ইত্যাদি গভীর রসের যাত্রা-নাটকের মর্মমূলে প্রবেশ করতে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না, 'বিদ্যাসুন্দর'-এর অভিনয়ে তাদের আমোদ উপভোগ করতে দেখে কোন হীন মন্তব্য করলে তা একদেশ-দর্শিতা বলেই মনে হওয়া স্বাভাবিক। এ প্রসঙ্গে ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মন্তব্যটি সমীচীন বিধায় উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন,—

"লেবেডেফ আশ্চর্য লোক-চরিত্রজ্ঞ ছিলেন; তৎকালীন সাধারণ বাঙালী দর্শকের শিল্পরুচির স্থূলতাটুকু ঠিক ধরিতে পারিয়াছিলেন। এই স্থূলতা সম্ভবতঃ তৎকালীন কালীয় দমন যাত্রার সঙ, মেথর-মেথরাণী, কালুয়া-ভুলুয়া প্রভৃতি রঙ্গচরিত্র হইতেই সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু সে যুগের যাত্রাভিনয়ে যে করুণরস ও ভক্তির সংমিশ্রণ থাকিত এই বিদেশী পর্যটক তাহার মূল্য সম্ভবতঃ বুঝিতে পারেন নাই। ফলে বাঙালীর চিত্ত ধাতুর মূলস্বরূপ—ভক্তি ও করুণরসের সংমিশ্রণ

অনুধাবনও করিতে পারেন নাই। সে-যুগের যাত্রাভিনয়ে কিছু কিছু লঘু ধরণের সঙ্ থাকিত, কিন্তু তাহা ছিল কতকটা 'ড্রামাটিক রিলিফ' জাতীয় ব্যাপার। করুণরস ও ভক্তির সংমিশ্রণে যে জাতীয় কৃষ্ণযাত্রা জনরুচির উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহার প্রবণতা লেবেডেফ বুঝিতে পারেন নাই—এ দেশে স্বল্পকাল অবস্থান করিয়া কোন বিদেশীর পক্ষে তাহা সম্ভবও নহে।"[৩৬]

লেবেডেফের ভাষা-শিক্ষক গোলোকনাথ দাসের উৎসাহে ও প্ররোচনায় তিনি 'The Disguise' নাটকের অভিনয়ে অগ্রসর হন। গোলোকনাথ দেশীয় অভিনেতা-অভিনেত্রী সংগ্রহের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ইয়োরোপীয় দর্শকগণের চিত্তবিনোদনের জন্য লেবেডেফ তদানীন্তন গভর্নর-জেনারেলের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করেন। স্যর জন্ শোর লেবেডেফের আবেদন মঞ্জুর করেন।[৩৭]

কলকাতার কেন্দ্রস্থল ডোমতলায় একটি বিস্তৃত নাট্যশালা নির্মাণ ও অভিনেতা-অভিনেত্রী সংগ্রহের কাজ শেষ হয়ে গেলে লেবেডেফ ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই নভেম্বর ক্যালকাটা গেজেটে একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করলেন।

By Permission of the Honorable the
Governor—General

—

MR. LEBEDEFF'S
New Theatre in the Doomtullah.
DECORATED IN THE BENGALLEE STYLE
will be opened very shortly, with a play called
THE DISGUISE,
The Characters to be supported by performers of both Sexes.
To commence with Vocal and Instrumental
Music, called
THE INDIAN SERENADE.

—

To those Musical Instruments which are held in esteem by the Bengallees, will be added European. The words of the much admired poet Shree Bhorot Chondro Ray, are set to Music.

BETWEEN THE ACTS.

Some amusing Curiosities will be introduced.

—

The Day for Exhibition, together with a particular detail of the performance, will be notified in the course of the next week.

উদ্ধৃত বিজ্ঞাপনের তিন সপ্তাহ পরে ২৬শে নভেম্বর 'ক্যালকাটা গেজেটে' আর একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে অভিনয়ের স্থান-কাল, প্রবেশ দক্ষিণা প্রভৃতি জানিয়ে দেওয়া হল।

১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর মহাসমারোহে নাটকটি অভিনীত হয়েছিল। ঐ নাটকের মাত্র একটি অঙ্কই সেদিন মঞ্চস্থ হয়েছিল। লেবেডেফ এই নাটকের পুনরাভিনয়ের ব্যবস্থা করলেন ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে মার্চ। দ্বিতীয় অভিনয় রজনীতে নাটকটির পূর্ণাঙ্গরূপ প্রদর্শিত হয়।

নাটকটির অভিনয়ে দু'দিনই দর্শকের ভিড় হয়েছিল। আসনসংখ্যা নির্দিষ্ট থাকায় (দু'শ মাত্র) এই অভিনয় দর্শনের ভাগ্য অনেকেরই হয়নি। তাছাড়া দর্শনীয় মূল্যাধিক্য ছিল সাধারণ মানুষের কাছে আকাশ ছোঁয়া। প্রথমদিনের অভিনয়ের প্রবেশমূল্য দ্বিতীয় অভিনয়ে বাড়িয়ে এক মোহর করা হয়েছিল। তবুও লেবেডেফের বক্তব্য থেকে জানা যায়, দুটি অভিনয়েই নাট্যশালা দর্শকে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।[৩৮] এই অভিনয় সাফল্যই তাঁর পক্ষে কাল হয়ে দেখা দিয়েছিল। ইংরেজ রাজপুরুষগণের সক্রিয় বিরোধিতায় অবশেষে লেবেডেফকে এদেশে নাট্যচর্চার আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করতে হল। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে লেবেডেফের অনেক সাধের রঙ্গালয় ও তার আসবাবপত্র জলের দামে বিক্রি হয়ে গেল।[৩৯] লেবেডেফের নাট্যশালা ভেঙ্গে গেল সত্য, কিন্তু তিনি যে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বীজ বপন করলেন পরবর্তী কালে নানা ঘটনা ও মানসিকতার মধ্য দিয়ে তাই এক বিশাল মহীরুহে পরিণত হল। বাংলাদেশে এই বিদেশী শিল্পরসিক লেবেডেফ বাংলা নাট্য-আন্দোলন ও নাটকের উদ্ভবে প্রেরণাস্থল হয়ে রইলেন। ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও তাই তাঁর কৃতিত্বকে অস্বীকার করা যায় না। "তাঁহার গৌরব তিনি সেই যুগে কলিকাতায় একটি বঙ্গীয় নাট্যশালা খুলিলেন এবং তাহার নাম দিলেন Bengali Theatre, এবং সেই নাট্যশালায় অধিকাংশ বাংলায় লিখিত নাটক বাঙ্গালী অভিনেতা ও অভিনেত্রী দ্বারা অভিনীত করাইলেন। নাটকের অপকর্ষের কথা মনে রাখিয়াও বলিতে হয় লেবেডেফ বঙ্গীয় নাট্যশালার জনক। যিনি প্রথম তিনি উৎকৃষ্ট না হইলেও প্রথম।"[৪০]

॥ ৩ ॥

লেবেডেফের পর বাংলাদেশে বাঙালী প্রতিষ্ঠিত দেশী নাট্যশালার আবির্ভাব ঘটল দীর্ঘ ছত্রিশ বছর পর ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত 'হিন্দু থিয়েটার'ই একজন বাঙালীর প্রতিষ্ঠিত প্রথম বঙ্গীয় নাট্যশালা। 'বেঙ্গলী থিয়েটার' এবং 'হিন্দু থিয়েটারে'র মধ্যবর্তী এই দীর্ঘ ছত্রিশ বছর বাংলাদেশে যে নাট্যশালা বা নাট্যচর্চা ছিল না এমন নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্বকে বলতে পারি যুগ পরিবর্তনের কাল। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা শুধু বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রেই নবযুগের সূচনা করল না বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনেও এই কলেজের পরোক্ষ প্রভাব কম নয়। এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়া অবধি চিরাচরিত যাত্রা, কবি, পাঁচালী, খেউড়, আখড়াই প্রভৃতি ছিল সাধারণ বাঙালীর আমোদ-প্রমোদের একমাত্র মাধ্যম। কিন্তু হিন্দু কলেজ প্রদত্ত ইংরেজী কাব্য-নাট্যসাহিত্যের পাঠ নব্যশিক্ষিত ছাত্রগণের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন সাধন করল। ইংরেজী কাব্য-নাটকের রসাস্বাদ প্রাপ্ত নব্যশিক্ষিত বাঙালীর কাছে যাত্রা ইত্যাদি শুধু অরুচিকরই মনে হল না বরং আমোদ-প্রমোদের এই ব্যবস্থাগুলিকে তাঁরা ঘৃণ্য বলেই মনে করতেন। ফলতঃ, ইংরেজদের স্থায়ী-অস্থায়ী রঙ্গালয়ে আয়োজিত আমোদ-প্রমোদে সাধ্যমত উপস্থিত থেকে তাঁরা তাঁদের সাংস্কৃতিক ক্ষুন্নিবৃত্তির প্রয়াস পেতেন। 'ওল্ড প্লে হাউস', 'ক্যালকাটা থিয়েটার', 'মিসেস ব্রিস্টোর প্রাইভেট থিয়েটার'-এর কথা বলেছি। লেবেডেফের 'বেঙ্গলী থিয়েটার' জনপ্রিয় হলেও নানাকারণে চার-পাঁচ মাসের মধ্যেই তার দ্বার রুদ্ধ হয়েছিল। বিপত্তির 'বন্ধুর পন্থা' ডিঙিয়ে 'ক্যালকাটা থিয়েটার' ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত টিকে ছিল।

'ক্যালকাটা থিয়েটার' বন্ধ হয়ে গেলে পর দীর্ঘ তিনবছর কলকাতায় আর কোন রঙ্গালয়ের খবর পাওয়া যায় না। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে মার্চের 'ক্যালকাটা গেজেটে' একটি নতুন রঙ্গালয়ের খবর দিলেন ঐ ভাবী রঙ্গালয়ের মালিক মিঃ মরিস। ১৮, সার্কুলার রোডে ৩০শে মার্চ, ১৮১২ 'এথেনিয়াম থিয়েটারে'র দ্বারোদ্ঘাটন হল বিয়োগান্তক নাটক 'আর্ল অব এ সেক্স' ও একখানি প্রহসন 'রেজিং দি উইণ্ড'-এর-অভিনয়ের মাধ্যমে। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে মার্চ থেকে ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৯ শে নভেম্বর (শেষ অভিনয় রজনী) পর্যন্ত প্রায় দু'বছরের 'এথেনিয়াম থিয়েটারে'র ইতিহাস ব্যর্থতা আর বিরূপ সমালোচনায় ভরা। ব্যর্থতা ছাড়াও আরেকটি ঘটনা এথেনিয়াম থিয়েটারের অন্তিমকালকে ত্বরান্বিত করেছিল। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে নভেম্বর 'চৌরঙ্গী থিয়েটারে'র দ্বারোদ্ঘাটন হল। কলকাতার নাটকের ইতিহাসে 'চৌরঙ্গী থিয়েটার' একটি বহু উচ্চারিত নাম। তদানীন্তন গণ্যমান্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সমবেতভাবে এই রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হয়েছিলেন। চাঁদার

ভিত্তিতে শেয়ার গ্রহণ করে এই রঙ্গালয়ের সৃষ্টি হয়েছিল বলে 'সাবস্ক্রিপশন থিয়েটার' নামেও এই রঙ্গালয় পরিচিত ছিল। 'চৌরঙ্গী থিয়েটারে'র পৃষ্ঠপোষকগণের মধ্যে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত অধ্যাপক হোরেস হেম্যান উইলসন; হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন ডি. এল. রিচার্ডসন প্রমুখ আরো অনেকের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন অ্যামেচার ড্রামাটিক সোসাইটির সভ্য দ্বারকানাথ ঠাকুর।[৪১]

অনেক নামকরা উঁচুদরের অভিনেতা-অভিনেত্রীর সমাবেশ ঘটেছিল 'চৌরঙ্গী থিয়েটারে'। কিন্তু এই রঙ্গালয়ের প্রভূত গৌরব ও যশের কারণ যিনি, তিনি 'দেশের মাটিতে বিদেশী রঙ্গালয়ের মূর্তিমতী বিস্ময়' 'ইণ্ডিয়ান সিডানস্' মিসেস এসথার লীচ্। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩১ শে মে-র মধ্যরাতে অত্যন্ত বিস্ময়জনকভাবে অগ্নিকাণ্ডে এই মঞ্চ ভস্মীভূত হওয়ার পূর্বপর্যন্ত কলকাতার ইংরেজ দর্শকদের বহু সার্থক অভিনয় রজনী উপহার দিয়েছিল এই 'চৌরঙ্গী থিয়েটার'। সাফল্য ও জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও শেষ দিকে এই রঙ্গমঞ্চের অবস্থা পূর্বসূরীদের মতই হয়ে পড়েছিল। অর্থাভাব দিন দিন প্রকট হয়ে উঠছিল। তাছাড়া ১৮৩৮-এর জানুয়ারীতে মিসেস লীচ্ যখন স্বাস্থ্যোদ্ধারের আশায় বিলেত যাত্রা করলেন, তখন থেকেই দর্শকমন এই প্রতিভাময়ী অভিনেত্রীকে হারিয়ে হতাশ হয়ে পড়েছিল।

'চৌরঙ্গী থিয়েটারে'র পরে কলকাতার প্রখ্যাত ইংরেজী রঙ্গমঞ্চ সাঁ সুসি রঙ্গালয়। এই রঙ্গালয়ের কথা আলোচনা করবার আগে বাংলা নাটক ও বঙ্গরঙ্গমঞ্চের অবস্থাটি পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 'হিন্দু থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে কলকাতার যাত্রা-জাতীয় নাটক রচনা ও অভিনয়ের দু'একটি প্রচেষ্টার কথা জানা যায়। উনিশ শতকের গোড়া থেকেই কলকাতায় যে সখের যাত্রার উৎপত্তি হয়েছিল এগুলি সম্ভবতঃ তা থেকে কিছু স্বতন্ত্রই ছিল।[৪২] কিন্তু 'সমাচার দর্পণে'র সংক্ষিপ্ত বিবরণ ছাড়া এগুলি সম্পর্কে আর বিশেষ কিছু জানা যায় না। এ ধরনের যাত্রার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'কলিরাজার যাত্রা'। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারীর 'সমাচার দর্পণে' এই যাত্রা-নাটকাভিনয়ের যে সমালোচনা প্রকাশিত হয় তাতে এই অভিনয়ে যাত্রার স্বরূপটিই বেশী স্পষ্ট হয়েছে। 'সমাচার দর্পণে'র প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করলেই এই অভিমতের যাথার্থ্য নিরূপিত হবে।

> "নূতন যাত্রা" এই ক্ষণে শ্রুত হইল যে কলিকাতাতে নূতন এক যাত্রা প্রকাশ হইয়াছে। তাহাতে অনেক ২ প্রকার ছদ্মবেশধারী আরোপিত বিবিধ গুণগণ বর্ণনাকারী মনোহর ব্যবহারী অর্থাৎ সং হইয়া থাকে···এসকল সং ক্রমে আগত একত্র মিলিত হইয়া বিবিধ বেশ বিন্যাস বিলাস হাস্য রহস্য সম্বলিত অঙ্গভঙ্গ পুরঃসর

নর্ত্তন কোকিলাদি স্বর ন্যক্কৃত মধুর স্বরে গান নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র বাদন আশ্চর্য্য ২ প্রশ্নোত্তর ক্রমে পরস্পর মৃদু মধুর বাক্যালাপ কৌশলাদির দ্বারা নানা দিগ্দেশীয় বিজ্ঞাবিজ্ঞ সাধারণ সর্ব্বজন মনোমোহন প্রভৃতি করেন এই অপূর্ব্ব যাত্রা প্রকাশে অনেক ২ বিজ্ঞ লোক উৎসুক এবং সহকারী আছেন অতএব বুঝি ক্রমে ২ ঐ যাত্রার অনেক প্রকার পরিপাটী হইতে পারে।"

এ সময় সম্ভবতঃ আরও কয়েকটি যাত্রা নাটক লিখিত হয়ে থাকবে। 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকায় 'সম্বাদ কৌমুদি'র ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের পঞ্চম সংখ্যায় প্রকাশিত 'নবপ্রকাশিত নাটকগুলির কুরুচি' (The evil tendency of the dramas lately invented) শীর্ষক একটি প্রবন্ধের উল্লেখ আছে। কিন্তু এই নাটকগুলির মধ্যে একমাত্র 'কলিরাজার যাত্রা' ছাড়া অন্য কোন নাটকের অভিনয় বিবরণ পাওয়া যায় না। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জুলাই তারিখের 'সমাচার দর্পণে' ভবানীপুরের 'কতকগুলি ভদ্রসন্তান কর্তৃক অনুষ্ঠিত' 'নলদময়ন্তী যাত্রা'র উল্লেখ আছে। এই 'নলদময়ন্তী'র অভিনয় বিবরণও 'কলিরাজার যাত্রা'র অনুরূপ। এর পরেও কলকাতায় এধরনের নতুন যাত্রা একেবারে অপ্রচলিত ছিল না। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে জোড়াসাঁকোর রামচাঁদ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক 'নন্দবিদায় যাত্রা' অনুষ্ঠানের বিবরণ পাওয়া যায়।

আগেই উল্লেখ করেছি, ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজ নব্যশিক্ষিত বাঙালীর মনে এক বৈপ্লবিক চিন্তার জন্ম দিয়েছিল। এই কলেজের অধ্যাপক ক্যাপ্টেন রিচার্ডসনের শেক্সপীয়র পাঠ ও আবৃত্তি শিক্ষার্থিগণের কাছে বিস্ময়কর ছিল। ছাত্রদের তিনি অভিনয় ব্যাপারে সর্বদাই উৎসাহিত করতেন।[৪৩] কলকাতার ইংরেজী রঙ্গমঞ্চগুলি পরোক্ষভাবে শিক্ষিত বাঙালীর অন্তরে অভিনয় স্পৃহা জাগিয়ে তুলেছিল, একথা নিশ্চিত। এ ভাবেই ক্রমশঃ শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে ইংরেজী ধরনের নিজস্ব রঙ্গমঞ্চের অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হতে থাকে। বুভুক্ষিত বাঙালীর এই মর্মবেদনা সেদিন অতি স্পষ্টভাবে 'সমাচার চন্দ্রিকা' তুলে ধরেছিল তার সম্পাদকীয় নিবন্ধে। বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে এই প্রতিবেদনের গুরুত্ব কম নয় বলেই তা এখানে উদ্ধৃত হল।

> "এই বিস্তীর্ণ নগরে নগরবাসীদিগের উপকার ও উৎকর্ষের নিমিত্ত নানাবিধ জনহিতকর ও অভিনব প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের চিত্তবিনোদনের কোন ব্যবস্থা হয় নাই এবং ইংরেজ সম্প্রদায়ের মত তাহাদের আমোদ-প্রমোদের কোন সাধারণ স্থান নাই। পূর্বকালে ভারতবর্ষীয় রাজাদিগের সভায় নটনটী থাকিত, তাহারা অভিনয় প্রদর্শন করিয়া এবং সুললিত কাব্য, সঙ্গীত ও অঙ্গভঙ্গী দ্বারা লোকের মনোরঞ্জন করিত। সম্প্রতি

আমাদের সমক্ষেও সখের যাত্রা প্রদর্শিত হইয়াছে। এগুলি সর্বাঙ্গ সুন্দর না হইলেও লোকের আনন্দ বর্ধন করিয়াছিল। (which though not perfect gave great diversion to the people) কিন্তু সখের যাত্রাও কদাচিত হয়। সুতরাং ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা যাহাতে একত্র হইয়া ইংরেজদের মত 'শেয়ার' গ্রহণ করিয়া (on the principle of shares) একটি নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাহাতে একজন কর্মাধ্যক্ষের অধীনে বেতনভোগী যোগ্য ব্যক্তি নিযুক্ত করিয়া এতদর্থে বিরচিত গীতি ও কাব্যের মাসে একবার নূতন অভিনয় করেন। এইরূপে শ্রেণী-নির্বিশেষে সমাজভুক্ত সকলেরই আনন্দবৃদ্ধি হইবে। ...'exhibit a new performance of songs and poetry once a month, conformably to the written nataks, or plays and under the authority of a manager, such a plan will promote the pleasure of all classes of society.)[৪৪]

'সমাচার চন্দ্রিকায়' যৌথ প্রচেষ্টায় ('শেয়ার' গ্রহণ করিয়া) রঙ্গালয় স্থাপন করবার প্রতি যে ইঙ্গিত করা হয়েছিল প্রকৃত প্রস্তাবে তা 'ন্যাশনাল থিয়েটারে'র আগে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। বরং রাজা-মহারাজা, ধনী গৃহস্থগণ এককভাবে রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করে এই নাট্যান্দোলনকে জীইয়ে রাখলেন ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর নারিকেলডাঙ্গার বাগান বাড়িতে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 'হিন্দু থিয়েটার'-এর দ্বারোদ্ঘাটনের মধ্য দিয়েই এই ধারার সূত্রপাত। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বরের 'সমাচার দর্পণ' এ-প্রসঙ্গে একটি সংবাদ পরিবেশন করে।

"এতদ্দেশীয় নর্ত্তনাগার॥—কিয়ৎ কালাবধি কলিকাতাস্থ এতদ্দেশীয়দের মধ্যে এক নর্ত্তনাগার গ্রন্থন নিমিত্ত আন্দোলন হইতেছে। তদর্থ বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের অনুরোধে এতদ্দেশীয় শিষ্ট বিশিষ্ট মহাশয়দের গত রবিবারে এক বৈঠক হয়.....। ঐ নর্ত্তনশালা ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের রীত্যনুসারে প্রস্তুত হইবেক এবং তন্মধ্যে যে সকল নাটকের ক্রীড়া হইবে সে সকলি ইঙ্গলণ্ডীয় ভাষায়।"

বস্তুতঃ, হিন্দু থিয়েটারে, যে কটি নাটক অভিনীত হয়েছিল, তার সবকটির ভাষাই ইংরেজী। এমনকি প্রথম অভিনয় রজনীতে অভিনীত নাটকও পণ্ডিত হোরেস হ্যামেন উইসন অনূদিত ভবভূতির 'উত্তররামচরিত' ও 'জুলিয়াস সিজারে'র পঞ্চম অঙ্ক। ১৮৩২-এর ২৯শে মার্চ এই মঞ্চে মোটামুটি সাফল্যের সঙ্গেই ইংরেজী 'Nothing Superfluous' প্রহসনের অভিনয় হয়। 'হিন্দু থিয়েটারে'র অভিনয় কুশলতার বিষয়ে খুব বেশী কিছু জানবার উপায় নেই। 'উত্তররামচরিতে'র অভিনয় সম্পর্কে জনৈক পাঠক ১৮৩২ সনের

৭ই জানুয়ারী তারিখের 'সমাচার দর্পণে' একটি পত্র প্রকাশ করে যে মতামত ব্যক্ত করেন তাতে দেখা যায়, তিনি এই অভিনয়কে প্রচলিত রামযাত্রার অভিনব সংস্করণ ছাড়া আর কিছু মনে করতে পারেননি।

এই রঙ্গমঞ্চ খুব বেশীদিন স্থায়ী হতে পারেনি। অভিনয় জগতে কোন কৃতিত্বের স্বাক্ষর না রাখতে পারলেও বাঙালী প্রতিষ্ঠিত প্রথম রঙ্গালয় হিসেবে এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এই রঙ্গালয়ের স্বল্পকালীন স্থায়িত্বের কয়েকটি কারণ অনুমান করা যেতে পারে। কোন ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় মঞ্চাভিনয়ের বিপুল ব্যয়ভার দীর্ঘদিন যাবৎ বহন করার দুরূহতা এ-প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার। তাছাড়া এখানে যেসব নাটক অভিনীত হত, সেগুলি সবই ছিল ইংরেজী ভাষার। কলকাতায় তখন 'চৌরঙ্গী থিয়েটারে'র অভিনয়খ্যাতি বহুদূর প্রসারিত। যেখানে ইংরেজী রঙ্গমঞ্চে ইংরেজ অভিনেতা-অভিনেত্রী কর্তৃক ইংরেজী নাটকের অভিনয় চলছে তখন সেখানে একজন বাঙালীর প্রচেষ্টায় ঐ ধরনের ইংরেজী নাটকের জনপ্রিয়তা কখনই বেশী হতে পারে না। অধিকন্তু 'হিন্দু থিয়েটার' সাধারণ দর্শকের জন্য উন্মুক্ত ছিল না। সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয় ও দেশীয় ভদ্রলোকদের জন্য প্রতিষ্ঠিত এই নাট্যশালা জনচিত্তকে প্রভাবিত করতে পারেনি। যাঁদের জন্য এই রঙ্গালয়ের দ্বার উন্মুক্ত ছিল, তাঁরা ইংরেজী রঙ্গালয়ের প্রতিই অধিকতর আকৃষ্ট হবেন, তাতে সন্দেহ কি। প্রসন্নকুমারের পর এদেশে আর কেউ এমন ইংরেজী নাট্যশালা প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হননি।

এদিক থেকে সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছিলেন নবীনচন্দ্র বসু। শ্যামবাজারের নবীনচন্দ্র বসুর বাড়িতে বিলাতি ধরণের যে রঙ্গমঞ্চটি প্রতিষ্ঠিত হল, তাতেই বাঙালীর দ্বারা বাংলা রঙ্গমঞ্চে বাংলা নাটকের সর্বপ্রথম অভিনয়। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের থিয়েটার স্কুল অথবা কলেজের ড্রামাটিক ক্লাবের বৃহত্তর সংস্করণের মত একটা বিষয় ছিল।[৪৫] নবীন বসুর রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে কিন্তু তা বলা যাবে না। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের 'হিন্দু পাইয়োনীয়ার' পত্রে এই রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে একটি বিবরণীতে বলা হয়,—"This private theatre, got up about two years ago, is still supported by Babu Nabinchandra Bose." ১৮৩৫-এর দু'বছর আগে অর্থাৎ ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দ এই রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠাকাল। অভিনয় ব্যবস্থা এবং পাত্র-পাত্রী প্রসঙ্গে বলা হয়,—"এই অভিনয় দেশীয়, ইংরেজী ধরণে সম্পূর্ণভাবে হিন্দুদের দ্বারা দেশের ভাষায় হইয়া থাকে। ইহাতে আর একটি ব্যাপারও দেখা যায় যাহা আমাদের এবং ভারতবর্ষের উন্নতিকামী বন্ধুমাত্রেরই নিকট অতিশয় আনন্দের বিষয়—এই নাট্যশালায় বাঙালী রমণীরা সর্ব্বদাই দেখা দিয়া থাকেন, কারণ, স্ত্রীলোকের অংশের অভিনয় ইহাতে হিন্দু রমণীরাই করিয়া থাকেন।"[৪৬]

১৮৩৫ সনের ৬ই অক্টোবর নবীন বসুর রঙ্গমঞ্চে বিদ্যাসুন্দরের অভিনয় হয়। এই নাটকটির রচয়িতার নাম জানা যায় না। 'হিন্দু-পাইয়োনীয়ার'-এ এই অভিনয়ের একটি বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়। দীর্ঘ এই বিবরণীর মূল বক্তব্য হল, এই অভিনয় দর্শনে দর্শকগণ আনন্দলাভ করেছিলেন। অভিনয়ে 'স্ত্রী'-চরিত্রগুলি মহিলা অভিনেত্রীদের দ্বারাই অভিনীত হয়েছিল। এই পত্রিকা বিদ্যার ভূমিকায় রাধামণির উচ্চপ্রশংসা করেছেন। অন্যান্য স্ত্রীচরিত্রগুলির অভিনয়ও সুন্দর হয়েছিল। পুরুষ চরিত্রের মধ্যে রাজা বীরসিংহের অভিনয়নৈপুণ্যের প্রশংসা করা হয়েছে। অভিনয় বিবরণে সেতার, সারঙ্গ, পাখোয়াজ, বেহালা প্রভৃতি যন্ত্রের একতান বাদনের উল্লেখ আছে। নাটকে চিত্রিত দৃশ্যপট ব্যবহৃত হয়েছিল। অভিনয় বর্ণনার পর লেখক এই অভিনয়ের দ্বারা স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের মত সমাজ-সংস্কারের একটি ধারা যে সূচিত হয়েছে, এমন মন্তব্যও করেছেন।[৪৭] 'হিন্দু পাইয়োনীয়ারে'র দীর্ঘ বিবরণীতে 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকটির উপস্থাপনা বিষয়ে কোন মন্তব্য নেই। এবিষয়ে নগেন্দ্রনাথ বসু কিছু আলোকপাত করেছেন। তিনি লিখেছেন,—

> "নাটকোক্ত দৃশ্যাবলী বাটীর নানাস্থানে প্রকৃত সজ্জাদিদ্বারা সাজান হইয়াছিল। এক ঘর হইতে অন্য ঘরের মধ্যে মৃত্তিকা খনন করিয়া সুরঙ্গ করা হইয়াছিল। বকুলতলার পুষ্করণীর দৃশ্য প্রকৃত প্রস্তাবে অট্টালিকা-সংলগ্ন উদ্যানের পুষ্করণীতীরে সজ্জিত হইয়াছিল। অট্টালিকাসংলগ্ন উদ্যানের এক পার্শ্বে মালিনীর কুটীর ও মালঞ্চ গুছান হইয়াছিল। একস্থানে এক দৃশ্যের অভিনয় দেখিয়া, অন্যদৃশ্য দর্শনের জন্য যেখানে সেই দৃশ্য সাজান হইয়াছে, দর্শকগণকে সেইখানে উঠিয়া যাইতে হইত। প্রথম অভিনয়ে এই রূপে ছুটাছুটি করিয়া অভিনয় দেখিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল।"[৪৮]

বিদ্যাসুন্দরের অভিনয় 'হিন্দু পাইয়োনীয়ারের' লেখককে আনন্দিত ও উচ্ছ্বসিত করলেও অনেকেই কিন্তু একে সুনজরে দেখেননি। এমনকি এ ব্যাপারে পাইয়োনীয়ারকে আক্রমণ করতেও তাঁরা ছাড়েননি! 'ইংলিশম্যান এণ্ড মিলিটারী ক্রনিক্‌ল্' পত্রে একটি বিরূপ সমালোচনা প্রকাশিত হয়।[৪৯] এই পত্রিকার বিরূপ মন্তব্য প্রসঙ্গে 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' লেখক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন—"ইংলিশম্যান পত্রিকার এই উক্তি আমাদিগকে বাংলা দেশের পরবর্তী এক যুগের অভিনয় বিদ্বেষের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।"[৫০] কিন্তু কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নক্সায়' 'শ্যামবাজার অঞ্চলের এক বনেদী বড়মানুষের বাড়ীতে বিদ্যাসুন্দর যাত্রা' অভিনয়ের যে কৌতুকপূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন, তা যদি নবীন বসুর উক্ত অভিনয় প্রসঙ্গে হয় তবে 'ইংলিশম্যান' যে বিরূপ সমালোচনা করেছেন তা ঠিক বিদ্বেষ-প্রসূত বলে মনে হবে না।

নবীন বসুর নাট্যশালা এর পরেও কিছুদিন চালু ছিল। পাইয়োনীয়ারের সংবাদ

অনুসারে এই মঞ্চে প্রতিবছর চার-পাঁচটি নাটক অভিনীত হত বলে জানা যায়। কিন্তু একমাত্র 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকাভিনয় ছাড়া অন্য আর কোন্ কোন্ নাটক এখানে অভিনীত হয়েছে তা জানা যায় না। অতিরিক্ত ব্যয় বাহুল্যের জন্যই সম্ভবতঃ কয়েক বছরের মধ্যে এই রঙ্গমঞ্চটি গতাসু হয়েছিল। নবীন বসুর পর নগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে একটি সখের নাট্যশালায় সাফল্যের সঙ্গে কিছু নাটক অভিনীত হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন নবগোপাল মিত্র।[৫১] এরপর প্রকৃতপক্ষে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে আশুতোষ দেবের বাড়িতে 'শকুন্তলা' নাটকের অভিনয়ের আগে পর্যন্ত বাঙালীর প্রতিষ্ঠিত রঙ্গমঞ্চের বাংলা নাটকের কোন অভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যায় না। অন্তর্বর্তীকালের দীর্ঘ এই ক'বছর যে বাঙালীর মধ্যে নাট্যচর্চা একেবারেই ছিল না, এমন নয়। সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ইংরেজী রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখতে যেতেন। স্কুল-কলেজে আয়োজিত ইংরেজী নাটকের অভিনয় ও কবিতা আবৃত্তিতে ছাত্রদের অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়ে এই ধারা ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বজায় ছিল। ১৮৩৭ সনের ২৯শে মার্চ বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে হিন্দু কলেজের বাঙালী ছাত্রগণ শেক্সপীয়র ও অন্যান্য কয়েকটি গ্রন্থের অংশ বিশেষ আবৃত্তি ও অভিনয় করে এই ধারার সূত্রপাত করেন।[৫২] হিন্দু কলেজের ছাত্রদের দ্বারা এই আবৃত্তি-অভিনয় প্রচেষ্টার অনুসরণ অন্যান্য বিদ্যালয়েও লক্ষ্য করা যায়।

ইতিমধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ প্রয়োজন। ১৮৩৯ সনে চৌরঙ্গী থিয়েটার ভস্মীভূত হয়ে গেলে কলকাতার ইংরেজ নাট্যরসিকগণ বিমর্ষ হয়ে পড়েন। কিন্তু নট-নাট্য-রসিক স্টোকলার নতুন রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার দুরূহ কাজের ভার গ্রহণ করলেন। সহযোগী হিসেবে পেলেন লণ্ডন থেকে সদ্যপ্রত্যাগত (জুন, ১৮৩৯) মিসেস লীচকে। ঐ বছরই ২১শে অগস্ট ডালহৌসী অঞ্চলে 'সাঁ সুসি থিয়েটারে'র দ্বারোদ্ঘাটন হল। ১৮৪৯ সালের ২১শে মে পর্যন্ত এই রঙ্গালয়ে বহু ইংরেজী নাটকের অভিনয় হয়েছিল। কিন্তু বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে এই রঙ্গালয় একটি বিশেষ কারণে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। ১৮৪৮ সালের ১৭ই অগস্ট এই মঞ্চে শেক্সপীয়রের বিশ্রুত নাটক 'ওথেলো'র অভিনয় হয়। নামভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন বৈষ্ণবচরণ আঢ্য। দেসদিমোনার ভূমিকায় স্বনামধন্যা মিসেস লীচ। ওথেলোর ভূমিকায় বৈষ্ণবচরণের অভিনয় সম্পর্কে 'সংবাদ প্রভাকর'[৫৩] এবং 'বেঙ্গল হরকরা'[৫৪] প্রশংসাই করেছেন। 'ক্যালকাটা স্টার'ও এই অভিনয়ের প্রশংসা করেছেন। কিন্তু 'ইংলিশম্যান' পত্রিকা বৈষ্ণবচরণের অভিনয়ের খুববেশী প্রশংসা করতে পারেননি।[৫৫] ১২ই সেপ্টেম্বর 'ওথেলো' নাটকের যে দ্বিতীয় অভিনয় হয়, 'ইংলিশম্যান' পত্রিকা সে অভিনয়ে বৈষ্ণবচরণের অভিনয়কে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেছেন।[৫৬] 'ওথেলো' চরিত্র মহাকবি শেক্সপীয়রের

এক অনবদ্য সৃষ্টি। এই চরিত্রের রূপায়ণ খুব সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। তবু বৈষ্ণবচরণ আঢ্য এই চরিত্রাভিনয়ে যে সাহস ও উদ্যমের পরিচয় দিয়েছিলেন, তার স্বীকৃতি ইতিহাসে থাকতেই হবে। "সেদিনের 'ইয়ংবেঙ্গল'-এর আত্মবিশ্বাস, উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং সৎ সাহসের পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল বৈষ্ণবচরণের মধ্যে, সে দিকটাও অবহেলার নয়। আর এই কারণেই এদেশের রঙ্গালয়ের ইতিহাসে চিরোজ্জ্বল থাকবে তাঁর নাম।"[৫৭]

॥ ৪ ॥

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের নাট্যসংস্কৃতি-কেন্দ্রিক মানসিকতাটিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে,

১. পাশ্চাত্য কাব্য-নাট্যসাহিত্যের মাধুর্য ও ঐশ্বর্যে বিমুগ্ধ নব্যশিক্ষিত বাঙাল প্রচলিত যাত্রা, পাঁচালী ইত্যাদির মধ্যে যথোপযুক্ত রসের অভাব অনুভব করেছে।

২. দেশী আমোদ-প্রমোদের মধ্যে নিজেদের খাপ খাওয়াতে না পেরে তাঁরা ইংরেজী কাব্য-নাটক ও অভিনয়ের মধ্যে সারস্বত তৃপ্তির সন্ধান করতেন।

৩. পাশ্চাত্য ধরনের রঙ্গমঞ্চ তৈরী করে কিংবা স্কুল কলেজে ইংরেজী নাটকের অভিনয়ের দ্বারা স্বাধীনভাবে আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করলেও ইংরেজদের দ্বারা—ইংরেজী রঙ্গমঞ্চে ইংরেজী নাটকের অভিনয়ের ঐশ্বর্য এবং ঔজ্জ্বল্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হীনপ্রভ হয়ে পড়ত।

৪. নবীন বসুর শ্যামবাজার রঙ্গমঞ্চে বাংলা নাটকের অভিনয় শিক্ষিত বাঙালী-মনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। এই রঙ্গমঞ্চে বছরে চার-পাঁচটি নাটকের অভিনয় হত বলে *'হিন্দু পাইয়োনীয়ারে'র সংবাদে জানা যায়।*

৫. ইংরেজী নাটকের অভিনয়ের দ্বারা ঈপ্সিত তৃপ্তি লাভ ঘটত না অথচ অভিনয় উপযোগী বাংলা নাটকের অভাব তীব্রভাবেই অনুভূত হচ্ছিল।

৬. বাংলা নাটক অভিনয়ের ক্রমবর্ধমান উপযোগিতা ক্রমশঃ অতি স্পষ্টভাবেই অভিব্যক্ত হচ্ছিল। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারী ওরিয়েন্টাল সেমিনারীর ইংরেজী নাট্যাভিনয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে 'হিন্দু পেট্রিয়ট'[৫৮] ওরিয়েন্টাল সেমিনারীর কর্মকর্তাগণকে বাংলা নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা করবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেছেন।[৫৯] এমনকি ঐবছর ৩রা মে প্যারিমোহন বসুর জোড়াসাঁকোর রঙ্গমঞ্চে 'জুলিয়াস সীজার' নাটক অভিনয় সম্পর্কে সমালোচনা প্রসঙ্গেও ঐ পত্রিকা বাঙালীগণকে বাংলা নাটক মঞ্চস্থ করবার জন্য অনুরোধ করেন।[৬০]

এই সময়েই একদিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত নাট্যাভিনয় (বিশেষতঃ ইংরেজী) এবং নবীন বসুর রঙ্গমঞ্চে বাংলা নাটকের অভিনয় যথার্থ বাংলা নাটক রচনার জন্য একটি সক্রিয় আগ্রহের সৃষ্টি করেছিল বলে মনে করতে পারি। বাংলা ভাষায় অভিনয় উপযোগী নাটকের অভাব তখন থেকেই তীব্রভাবে অনুভূত হল। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি এ-প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য,—

"বাংলা নাটকের অভাবে বাঙালী-প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালায় ইংরেজী নাটকের অভিনয় হইত, কিন্তু সেগুলির জনপ্রিয় হইবার সম্ভাবনা খুবই কম ছিল। ইংরেজী নাট্য-সাহিত্য যতই উচ্চাঙ্গের হউক না কেন, বাঙালী জনসাধারণের কথা দূরে থাকুক, ইংরেজী-শিক্ষালব্ধ বাঙালীর পক্ষেও সহজ ও স্বাভাবিকভাবে তাহার রসগ্রহণ একটু আয়াসসাধ্য ব্যাপার ছিল। সুতরাং নাট্যাভিনয়ের উৎসাহ ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝির কিছুদিন পর পর্যন্তও কৃত্রিমই ছিল। কিন্তু ঠিক এই সময়েই বাংলা দেশে নাট্যাভিনয় ও নাটক-রচনার ধারার একটা নূতনত্ব দেখা দিল।"[৬১]

ডঃ সুকুমার সেনের লেখাতেও অনুরূপ অভিমতই ব্যক্ত হয়েছে,—

"বাঙ্গালা নাটকের অভাবেই সে-যুগে বাঙ্গালা নাট্যশালা সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। এই অভাব তখন অনেকেই বোধ করিয়াছিলেন। ইহার মোচনের চেষ্টায় ঊনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ ও পঞ্চম দশকে বাঙ্গালা নাটক রচনার সূত্রপাত হইল।"[৬২]

কিন্তু একালের নাটক নামধেয় রচনাগুলি যে অভিনয়ের উদ্দেশ্যেই রচিত হয়েছিল, তা বলা যায় না। এ কালের নাট্য-প্রচেষ্টার আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল, এ-সময়ের বাংলা রচনাগুলির সবই সংস্কৃত নাটক-প্রহসন থেকে অনূদিত। নব্যশিক্ষিত বাঙালী ইংরেজী কাব্য-নাটকেরই ভক্ত ছিলেন, কিন্তু বাংলা নাটক রচনার এই অংকুর-পর্বে ইংরেজী নয়, সংস্কৃত নাটক-প্রহসনই গ্রাহ্য হল কেন ? এর কারণ সম্ভবতঃ এই যে,—

১. ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালী কোন রূপান্তরের চাইতে সরাসরি ইংরেজী কাব্য-নাটকেরই পাঠ ও অভিনয় করতেন।

২. পাশ্চাত্য ভাষায় (যে কোন ভাষার ক্ষেত্রেই অবশ্য সমভাবে প্রযোজ্য) স্বাভাবিক ব্যুৎপত্তি না জন্মালে সেই ভাষার মাধুর্য ও রসকে অনুবাদে সঞ্চারিত করা অসম্ভব। তাই,

৩. যাঁরা হয়ত ইংরেজী কিছু কিছু বুঝতেন কিন্তু সংস্কৃতই যাঁদের কাছে ইংরেজী অপেক্ষা অনেক সহজ বলে মনে হত, যাঁদের কাছে ইংরেজীর সমুদ্র লঙ্ঘন করে তার অন্তঃপুরে প্রবেশ দুরূহ ছিল, সংস্কৃত কাব্য-নাটক তাঁদের বেশী আকৃষ্ট করত।

৪. সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ কোন কোন পণ্ডিত ধর্মীয় আন্দোলনের সঙ্গে সংগতি পূর্ণ সংস্কৃত নাটক অনুবাদ করে সেই আন্দোলনের সহবর্তী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন। প্রবোধচন্দ্রিকার একাধিক অনুবাদ প্রচেষ্টা এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে মৌলিক বাংলা নাটকের উদ্ভবের পূর্ব পর্যন্ত প্রকাশিত বাংলা 'নাটক' আখ্যাত অনুবাদগুলির পরিচয় নিম্নরূপ,—

ক) রামচন্দ্র তর্কালংকার—'কৌতুকসর্বস্ব নাটক'—১৮২৮ (১২৩৫)

পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়—'রমণী নাটক'—১৮৪৮

'প্রেম নাটক'—১৮৫৩ (১২৬০)

দ্বারিকানাথ রায়—'বিল্বমঙ্গল নাটক'—১৮৪৫

উল্লিখিত রচনাগুলি মূলতঃ সস্কৃত নাটকের পাঠ্য অনুবাদ। এগুলি হয় গদ্যে, পদ্যে অথবা গদ্যে-পদ্যে রচিত আদিরসাত্মক বা উপদেশমূলক আখ্যায়িকা বা নক্সা।

খ) রামমোহন রায়ের উদ্যোগে বাংলা ভাষায় বেদান্ত চর্চার প্রবর্তন হলে সংস্কৃত অধ্যাত্মরূপক নাটক 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' নাটকের সমাদর বেড়ে গিয়েছিল এবং সেই সূত্রে অনেকেই এই নাটকের অনুবাদে উৎসাহিত হন। এই ধারার সবচেয়ে পুরনো অনুবাদ

?='আত্মতত্ত্ব কৌমুদী'—১৮২২

বিশ্বনাথ ন্যায়রত্ন—'প্রবোধচন্দ্রিকা'—(রচনা—(১২৪৬)-১৮৩৯) প্রকাশিত—১৮৭১ নাটকাকারে রচিত প্রথম অনুবাদ গ্রন্থ।

গ) জগদীশ—'হাস্যার্ণব'—১৮২২ (প্রহসন)=পাঠ্যগ্রন্থ।

নীলমণি পাল—'রত্নাবলী'—১৮৪৯-৫০=গদ্য-পদ্যাকারে পাঠ্যগ্রন্থ।

রামতারক ভট্টাচার্য—'অভিজ্ঞান শকুন্তলা'—(জ্ঞানদর্পণ যন্ত্রে মুদ্রাপ্যমাণ) ১৮৪৮, ২৮শে জুনের 'সংবাদ প্রভাকরে'র বিবৃতি অনুযায়ী।

উল্লিখিত নাটকাখ্যাত রচনাগুলি ছাড়াও এই পর্বে সম্ভবতঃ আরও কিছু সংস্কৃত নটিকের বাংলা অনুবাদ হয়েছিল, 'ভদ্রার্জুন' নাটকের 'বিজ্ঞাপনে' তারাচরণ শীকদার এমন ইঙ্গিত করেছেন। যাই হোক, এ পর্যন্ত অভিনয়োপযোগী বাংলা নাটকের সন্ধান পাওয়া গেল না। সুতরাং নাট্যামোদী বাঙালী জনগণের একটি অংশ তখনও পাশ্চাত্য নাটকের অভিনয় ও তদ্দর্শনে পরিতৃপ্ত হওয়ার চেষ্টা করত, আর একটি অংশ যাত্রা, কথকতা, পাঁচালী ইত্যাদির মধ্যেই নিজেদের মগ্ন রেখেছিল। কিন্তু অন্তরে অন্তরে যথার্থ বাংলা নাটক অভিনয়ের অভাব গভীরভাবেই অনুভব করছিল। বাংলা নাটকের এই 'বন্ধ্যাদশা'কে লক্ষ্য করে 'ভদ্রার্জুনে'র বিজ্ঞাপনে তারাচরণ একটি সুন্দর মন্তব্য করেছেন,—

"এতদ্দেশীয় কবিগণ প্রণীত অসংখ্য নাটক সংস্কৃত ভাষায় প্রচলিত আছে এবং তাহার

কয়েক গ্রন্থের অনুবাদও হইয়াছে, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, এদেশে নাটকের ক্রিয়া সকল রচনার শৃঙ্খলানুসারে সম্পন্ন হয় না। কারণ, কুশীলবগণ রঙ্গভূমিতে আসিয়া নাটকের সমুদায় বিষয় কেবল সঙ্গীতে দ্বারা ব্যক্ত করে, এবং মধ্যে মধ্যে অপ্রয়োজনেই ভণ্ডগণ আসিয়া ভণ্ডামি করিয়া থাকে। বোধ হয়, কেবল উপযুক্ত গ্রন্থের অভাবই ইহার মূল কারণ।"

প্রকৃতপক্ষে বাংলা নাটকের বন্ধন মুক্তি ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে। এ বছরই প্রকাশিত হল বাংলাভাষায় দুটি মৌলিক নাটক। জি. সি. গুপ্তের (যোগেন্দ্রচন্দ্র অথবা গোবিন্দচন্দ্র)[৬৩] 'কীর্তিবিলাস' ও তারাচরণ শীকদারের 'ভদ্রার্জুন'। রূপকথার বিশ্রুত 'বিজয়-বসন্ত' আখ্যান অবলম্বনে রচিত বাংলা ভাষায় প্রথম বিষাদান্তক নাটক (ট্র্যাজেডি) 'কীর্তি-বিলাস' এবং মহাভারতের অর্জুন কর্তৃক সুভদ্রাহরণ বৃত্তান্ত অবলম্বনে রচিত কমেডি 'ভদ্রার্জুন।' নাটক দুটি কোথাও অভিনীত হয়েছিল বলে আমরা জানি না। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে নাটক দুটির গুরুত্ব উপেক্ষণীয় নয়। বস্তুতঃ বাংলা নাটকের রচনাধারার সূত্রপাত এই দুটি নাটক থেকে, কিন্তু বাংলা নাটকের অভিনয় ব্যবস্থা হতে আরও পাঁচ বছর লেগেছিল। ১৮৫৭ সালে আশুতোষ দেবের বাড়িতে শকুন্তলার অভিনয় এই ধারার সর্বপ্রথম উদ্যোগ। ১৮৫২ থেকে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রচিত নাটকগুলির পরিচয় নিম্নরূপ,—

১৮৫২—জি. সি. গুপ্ত—কীর্তিবিলাস।
তারাচরণ শীকদার—ভদ্রার্জুন।
১৮৫৩—হরচন্দ্র ঘোষ—ভানুমতী চিত্তবিলাস।
কালীপ্রসন্ন সিংহ—বাবু নাটক।[৬৪]
১৮৫৪—রামনারায়ণ তর্করত্ন—কুলীন-কুলসর্বস্ব।
১৮৫৫—নন্দকুমার রায়—অভিজ্ঞান শকুন্তলা।
১৮৫৬—উমেশচন্দ্র মিত্র—বিধবা বিবাহ।
উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়—বিধবোদ্বাহ।
রাধামাধব মিত্র—বিধবা মনোরঞ্জন।
রামনারায়ণ তর্করত্ন—বেণীসংহার।
১৮৫৭—যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়—চপলা চিত্তচাপল্য।
বিহারীলাল নন্দী—বিধবা পরিণয়োৎসব।
কালীপ্রসন্ন সিংহ—বিক্রমোর্বশী।
রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—চিত্তবিনোদ।

'কীর্তিবিলাস' ও 'ভদ্রার্জুন' নাটক দুটি ছাড়া ১৮৫২-১৮৫৭ সাল পর্যন্ত রচিত নাটকগুলি প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর। এক, অনুবাদমূলক এবং দুই, সমাজ-সমস্যামূলক।

অনূদিত নাটক—হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' শেক্সপীয়ারের 'মার্চেন্ট অব ভেনিস'-এর অবলম্বনে লিখিত এবং রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'চিত্ত বিনোদ' 'দি ফেট্যাল কিউরিঅসিটি'র অনুবাদ। তাছাড়া 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা', 'বেণীসংহার' এবং 'বিক্রমোর্বশী' ঐ নামীয় সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ।

সমাজ-সমস্যা অবলম্বনে প্রথম নাটক রচনা করেন রামনারায়ণ তর্করত্ন। কৌলীন্য প্রথার নৃশংসতাকে নাট্যায়িত করা হয়েছে 'কুলীন-কুলসর্বস্ব' নাটকে। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বিধবা বিবাহ আইন বিধিবদ্ধ হলে এই বিষয়কে অবলম্বন করে অনেকগুলি নাটক রচিত হয়। উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা বিবাহ' এই জাতীয় প্রথম নাটক। উমেশচন্দ্রের আদর্শে রচিত অন্যান্য নাটকগুলি—'বিধবোদ্বাহ', 'বিধবা মনোরঞ্জন', 'চপলা চিত্তচাপল্য', 'বিধবা পরিণয়োৎসব।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম বাংলা নাটকের অভিনয় হয়। এবছর তিনটি রঙ্গমঞ্চে বাংলা নাটক অভিনীত হতে দেখি। ১. ৩০শে জানুয়ারী আশুতোষ দেবের বাড়িতে নন্দকুমার রায়ের অভিজ্ঞান শকুন্তলা ২. মার্চ মাসে রামজয় বসাকের বাড়িতে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন-কুলসর্বস্ব' এবং ৩. ১১ই এপ্রিল বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে রামনারায়ণের 'বেণীসংহার' অভিনীত হয়। ১৮৫৯ সনের ২৩শে এপ্রিল কেশব সেনের উদ্যোগে উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা বিবাহ' নাটকখানি অভিনীত হয়।

'কীর্তিবিলাস' এবং 'ভদ্রার্জুন' একই বছর (১৮৫২) প্রকাশিত হয়েছিল কিন্তু উভয় নাটকের পৌর্বাপর্ব নির্ধারণ করা যায়নি। অনভিনীত এই নাটক দুটির সাহিত্যমূল্য বিশেষ না থাকলেও এদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

'কীর্তিবিলাস' গদ্যে-পদ্যে রচিত পঞ্চাঙ্ক ট্র্যাজেডি। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম 'ট্র্যাজেডি' রচনার প্রয়াস হিসেবে এর ঐতিহাসিক মূল্য আছে। সপত্নী-পুত্রের প্রতি বিমাতার বিরূপতা—আলোচ্য নাটকের মুখ্য বর্ণিতব্য বিষয়। বাংলাদেশের একটি বিশিষ্ট রূপকথাকে (বিজয় বসন্ত বা শীত বসন্ত-এর কাহিনী) অবলম্বন করে এই নাটকের কাহিনী রচিত হয়েছে। সপত্নী-পুত্র কীর্তিবিলাস-এর প্রতি বিমাতা নলিনীর অনুচিত আসক্তিই হল নাটকীয় ঘটনার বীজ। শেক্সপীয়ারের 'হ্যামলেট' নাটকের প্রভাব 'কীর্তিবিলাসে' খুব সহজেই লক্ষ্য করা যায়। নায়ক কীর্তিবিলাসের সঙ্গে হ্যামলেটের সাদৃশ্য আছে। পরিণতিতে কতকগুলি মৃত্যু পরিস্থিতিকে জটিল ও অস্বাভাবিক করে তুলেছে। 'হ্যামলেটের' পরিসমাপ্তিতে যে মৃত্যু ও হত্যার দৃশ্য আছে তারই আদর্শে

নাট্যকার সম্ভবতঃ তাঁর নাটকের পরিকল্পনা করে থাকবেন। কিন্তু নাট্যরচনায় দক্ষতার অভাবে তিনি নাটকটিকে স্বাভাবিক ও সুন্দর করতে পারেননি। বাংলাদেশের একটি সাধারণ রূপকথার কাঠামোর মধ্যে 'হ্যামলেটে'র জটিলতাকে যুক্ত করতে গিয়ে জি. সি. গুপ্ত শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। ঘটনা সংস্থাপন, সংলাপ, চরিত্র চিত্রণ—কোন দিক দিয়েই তিনি দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেননি। কীর্তিবিলাসের ভাষা অত্যন্ত জড়তাপূর্ণ। পদ্যের ও গদ্যের ছাঁদ ঈশ্বর গুপ্তের অনুসারী। স্বগতোক্তির বাহুল্য এই নাটকের আরেকটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। কীর্তিবিলাসের বন্ধু মেঘনাদের চরিত্রটি ছাড়া কোন চরিত্রই জীবন্ত বলে মনে হয় না। নাটক হিসেবে কীর্তিবিলাস কোন দিক দিয়েই উল্লেখযোগ্য নয়। অথচ নাট্যকার জি. সি. গুপ্ত ইংরেজী নাটক এমনকি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নন্দনতত্ত্বে অবহিত ছিলেন বলেই মনে হয়। কীর্তিবিলাসের সুদীর্ঘ ভূমিকায় তিনি যে বক্তব্যের অবতারণা করেছেন তাতে নাটক সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। শেক্সপীয়ারের নাটক ছাড়া এরিষ্টটলের 'পোয়েটিক্স' এবং সেনেকার মতবাদ-এর সঙ্গেও তাঁর কিছু পরিচয় ছিল। ভারতীয় সাহিত্যে বিষাদান্তক নাটক রচনা করা নিষিদ্ধ অথচ নাট্যকার বিষাদান্তক নাটক রচনা-প্রয়াসী, তাঁর এই বিষাদান্তক নাটক রচনার কৈফিয়ৎ স্বরূপ তিনি একটি ভূমিকা রচনা করেছেন। স্বীয় প্রচেষ্টার সমর্থনে তিনি বলেন,—

> "শোকজনক ঘটনা আন্দোলন করিলে মনোমধ্যে এক বিশেষ সুখোদয় হয়, একারণ সেক্সপীয়ার নামা ইংলণ্ডীয় মহাকবি লিখিয়াছেন—
> আমার অন্তঃকরণ শোকানলে দহন হইতেছে, তত্রাপি আমার মন অবিরত ঐ শোক প্রয়াসী।"

'হর্ষ' ও করুণা'র প্রকৃতি উদ্ঘাটন প্রসঙ্গে বলেছেন,—

> "পতি লইয়া পতিব্রতা কামিনী পতিসহ আমোদ-প্রমোদে কালযাপন করিতে লাগিল, শুনিলে হর্ষ জন্মে, কিন্তু পতি বিয়োগে পতিব্রতা কামিনী পতিসহ প্রাণত্যাগ করিল শ্রবণে করুণা উপস্থিত হয়। হর্ষ ক্ষণিক, কিন্তু করুণা বহুকাল স্থায়িণী।"

ভারতীয় সাহিত্যে দুঃখান্তক রচনার অনুপস্থিতির কারণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন,—

> "ভারতীয় পূর্বতন পণ্ডিতেরা অনুমান করিতেন, যে ধার্মিক ব্যক্তির দুঃখাভিনয় করিবার সময়ে তাঁহাকে দুঃখার্ণবে রাখিয়া গ্রন্থ শেষ করিতে নাই। ইহা কেবল তাহাদিগের ভ্রান্তি মাত্র। জীবন ধারণ করিলেই ইষ্ট অনিষ্ট উভয়েরী ভোগী হইতে হইবে, ধার্মিক হইলেই যে আপদগ্রস্ত হইবে না, এমত নহে।
> 'অপিচ ধর্মশীল ব্যক্তি ক্লেশ প্রাপ্ত হইলে অন্তঃকরণে অধিক শোক হয়, সুতরাং

যে করুণাভিনয় অধর্মবিরুদ্ধ পুণ্যবান্ ব্যক্তির প্রাণত্যাগ, সেই করুণাভিনয় দেখিলে অধিক তাপ জন্মে।"

অবশেষে দেশ ভেদে ও প্রকৃতি ভেদে মানবরুচির বৈপরীত্য সম্পর্কে একটি কৌতূহলোদ্দীপক মন্তব্য করে আলোচনা শেষ করেছেন,—

"দেশ বিশেষে মানবগণের মনের ভাব ভিন্ন ভিন্ন হয়। শীতলদেশ নিবাসিগণ স্বভাবতঃ প্রগাঢ় চিন্তায় মত্ত হইতে অভিলাষ করে, কিন্তু উষ্ণদেশীয় লোকেরা হাস্যরসে প্রবৃত্ত। বঙ্গদেশ অতিশয় উষ্ণ সুতরাং বঙ্গদেশীয় লোকেরা হাস্য-রসাভিনয় অবলোকন করিতে সর্বদাই অভিলাষী।"

সর্বশেষ মন্তব্যটি লেবেডেফের মন্তব্যের অনুরূপ মনে হয়। কীর্তিবিলাসের পরিণতি পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শ অনুযায়ী (ট্র্যাজেডি) পরিকল্পিত হলেও এই নাটকে সংস্কৃত রীতির প্রাধান্য বর্তমান। নান্দী, সূত্রধার, নটী প্রভৃতি সংস্কৃত নাটকীয় রীতি কীর্তিবিলাস নাটকে যথাযথভাবেই অনুসৃত হয়েছে। নাটকীয় ঘটনাকে তিনি Act ও Scene অর্থাৎ অঙ্ক ও অভিনয়—এই দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন।

'কীর্তিবিলাস'-এর তুলনায় 'ভদ্রার্জুনের' নাট্যলক্ষণ অপেক্ষাকৃত বেশী। অর্জুন কর্তৃক সুভদ্রাহরণ—মহাভারতের আদি পর্বের এই বিশিষ্ট ঘটনাটি অবলম্বন করে তারাচরণ 'ইওরোপীয়' নাটকের শৃঙ্খলানুসারে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া' এই নাটকটি রচনা করেছেন। নাটকের প্রারম্ভে 'বিজ্ঞাপনে' তিনি তাঁর নাট্যকর্মের জ্ঞাতব্য তথ্য প্রকটিত করেছেন। 'নবীনা' 'দরিদ্রা' ও 'অলংকার পরিহীনা' বঙ্গভাষার সেবার জন্যই তিনি বিনীত ও সশ্রদ্ধ চিত্তে সাহিত্য কর্মে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। বাংলা নাট্যসাহিত্যের দুই পূর্বসূরী জি. সি. গুপ্ত এবং তারাচরণ শীকদার নাট্যচিন্তার ক্ষেত্রে মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। ভারতীয় সাহিত্যে বিষাদান্তক নাট্যপ্রয়াস নিষিদ্ধ তবুও জি. সি. গুপ্ত যে পাশ্চাত্য আদর্শে বিষাদান্তক নাটক রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন তাতে তাঁর নবযুগের অনুকূল সাহিত্য-সংস্কারপ্রবণ মানসিকতারই পরিচয় পাওয়া যায়। বিষয় বৈচিত্র্য সম্পাদন করে জি. সি. গুপ্ত যে কুশলতার পরিচয় দিয়েছিলেন পাশ্চাত্য রীতিতে বাংলা নাটকের কায়া-গঠনের সম্ভাব্যতার প্রতি ইঙ্গিত করে, তারাচরণ তেমনি আধুনিক বাংলা নাটকের অগ্রদূত হবার গৌরব অর্জন করলেন। বস্তুতঃ মধুসূদনের আগে একমাত্র তারা-চরণই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বাংলা নাটকের মুক্তি সংস্কৃতানুগত্যে নয়, বরং পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শের অনুসরণে। 'ভদ্রার্জুন' নাটকে অবলম্বিত রীতি সম্পর্কে নাট্যকার বলেছেন,—

"এ নাটক ক্রিয়াদি ও ঘটনাস্থানের নির্ণয় বিষয়ে ইওরোপীয় নাটকপ্রায় হইয়াছে। কিন্তু গদ্য পদ্য রচনার নিয়মের অন্যথা হয় নাই।"

"সংস্কৃত নাটক-সম্মত কয়েকজন নাট্যকারকের ক্রিয়াদি গ্রহণ করি নাই; যথা, প্রথমে নান্দী, তৎপরে সূত্রধার ও নটীর রঙ্গভূমিতে আগমন, তাহাদিগের দ্বারা প্রস্তাবনা ও অন্যান্য কার্য, এবং বিদূষক ইত্যাদি। এতদ্ব্যতিরিক্ত সংস্কৃত নাটক প্রায় ইওরোপীয় নাটক হইতে বিভিন্ন নহে।"

"সংস্কৃত নাটক প্রথমতঃ অঙ্কে বিভক্ত, যাহাকে ইংরাজি ভাষায় (Act) এক্ট কহে; কিন্তু প্রত্যেক (Act) এক্ট যেরূপ (Scene) সিনে বিভক্ত আছে, সংস্কৃত নাটক তাদৃশ নহে, তন্নিমিত্ত (Scene) সিন্ শব্দের পরিবর্ত্তে সংযোগস্থল ব্যবহার করা গেল। যে স্থান ঘটিত ক্রিয়াদি নাটকে ব্যক্ত হয় তাহাকেই (Scene) সিন্ কহে।"

তারাচরণ 'ভদ্রার্জুন' নাটকের প্রারম্ভে পাশ্চাত্য ক্লাসিক নাটকের prologue-এর মতো একটি 'আভাস' যোগ করে দিয়েছেন।

কীর্তিবিলাস-এর তুলনায় ভদ্রার্জুনের অভিনয় লক্ষণও বেশী। ভদ্রার্জুনের সংলাপ গদ্য পদ্য মিশ্রিত। পদ্য সংলাপগুলি বাদ দিলে গদ্য সংলাপগুলি অনেকটা মুখের ভাষার কাছাকাছি স্বীকার করতে হয়। সাধুরীতির ক্রিয়াপদ ও সর্বনামগুলি ছাড়া ভদ্রার্জুনের ভাষা অনেকাংশে কথ্যরীতির অনুসারী। "নাটকের কাহিনী দ্রুত-ঘটমান ঘটনারাশির মধ্য দিয়া বিকাশ ও পরিণতি লাভ করিয়া এক ঘনীভূত রস-চমৎকারিত্য উৎপাদন করিয়াছে। অসংলগ্ন ও অবান্তর ঘটনার উত্তাপে সেই রস ফিকে হইতে পারে নাই।"[৬৫]

পুরুষ চরিত্রের মধ্যে বলদেব চরিত্রটি সর্বাপেক্ষা প্রাণবন্ত। অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ তত সুপরিস্ফুট নয়। বরং নারী চরিত্রগুলি অনেকটা স্বাভাবিক। অপ্রধান চরিত্রগুলিও মন্দ নয়। সমকালীন যুগচিত্র প্রতিফলিত হয়েছে মদ্যপায়ীর চরিত্রে। এই নাটকে কয়েকটি গান সংযোজিত হয়েছে, যা' যাত্রাগানেরই প্রত্যক্ষ প্রভাব।

ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও 'কীর্তিবিলাস' ও 'ভদ্রার্জুনের' ঐতিহাসিক গুরুত্ব তাই অনস্বীকার্য। এই নাটক দুটি শুধু বাংলা নাটকের অগ্রদূত তাই নয়, বাংলা ভাষায় নাটক ও নাট্যতত্ত্ব-বিষয়ক আলোচনারও সূত্রপাত এই দুই গ্রন্থের ভূমিকায়।

এই বছরই হরচন্দ্র ঘোষ সেক্সপীয়ারের 'মার্চেন্ট অব ভেনিস্'-এর মর্মানুবাদ 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' রচনা করেন। গ্রন্থটি পরের বছর, ১৮৫৩ সনে প্রকাশিত হয়। নাটকটি সম্ভবতঃ হরচন্দ্র অভিনয়ের উদ্দেশ্যে রচনা করেননি। তাঁর আশা ছিল 'রচনা সৌষ্ঠব ও কাহিনী গৌরবে'র জন্য এটি পাঠ্য গ্রন্থ হিসেবে গৃহীত হবে। কিন্তু তাঁর এই আশা ব্যর্থ হয়েছিল। নাটক হিসেবে 'ভানুমতী-চিত্তবিলাস'-এর মূল্য অকিঞ্চিৎকর। অবান্তর পাত্র-পাত্রী, নাটকের শেষে অতিরিক্ত দৃশ্য সংযোজন ও ভাষার জটিলতার জন্য 'ভানুমতী-

চিত্তবিলাস' রসিক-জনচিত্ত আকৃষ্ট করতে পারেনি। তথাপি ঐতিহাসিক গুরুত্ব থেকে এ বইটি বঞ্চিত নয়। এতকাল পর্যন্ত সংস্কৃত নাটক-প্রহসনেরই অনুবাদ হয়েছে। লেবেডেফকে ছেড়ে দিলে, হরচন্দ্র সেই সংস্কৃতানুগত্যের ধারায় ইংরেজী নাটকের অনুবাদ করে বিষয়-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করবার ঐতিহাসিক মর্যাদা লাভ করেছেন। বস্তুতঃ, এর পর থেকে সংস্কৃত নাটকের অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজী নাটক বিশেষ করে সেক্সপীয়ারের নাটকের অনুবাদের প্রতিও বঙ্গীয় নাট্যকারদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল।

হরচন্দ্র ঘোষ এর পর আরও তিনটি নাটক রচনা করেছিলেন। কাশীরামদাসের মহাভারতের "কিয়দ্ভাগের প্রাচীন পরিচ্ছেদ যাহা মলিন মুদ্রাযন্ত্রের মুদ্রাদোষে ক্রমশঃ মলিনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা পরিবর্তন" করে হরচন্দ্র "ঐ মহাগ্রন্থের কিয়দাংশ এতাবতা রাজা দুর্যোধনের উরু ভঙ্গাবধি ও অন্ধ রাজাদির খঞ্জানলে দগ্ধ হওয়া পর্যন্ত অপূর্ব বৃত্তান্ত সুমার্জিত সাধুভাষায় বহুলাংশ ছন্দে ও অতি স্বল্পাংশমাত্র পদ্য প্রবন্ধে ইংলণ্ডীয় নাটকের প্রচলিত প্রণালীতে" ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে 'কৌরব বিয়োগ' নামক একটি নাটক রচনা করেন। ১৮৬৪ সনে 'রোমিও জুলিয়েট' অবলম্বনে 'চারুমুখ চিত্তহরা' এবং ১৮৭৪ সনে 'ব্রহ্মদেশীয় এক মনোহর কাব্য আধুনিক নাটকের প্রণালীতে লিখিয়া' 'রজত গিরিনন্দিনী' নাটক রচনা করেন।

হরচন্দ্রের কোন নাটকই পাঠ্য বা নাট্য হিসেবে সার্থক হয়নি। রচনা রীতি, ভাষা প্রভৃতির দোষ-ত্রুটি ছাড়াও তাঁর ব্যর্থতার অন্যতম কারণ, রচনায় লালিত্য ও রসের অভাব।

॥ ৫ ॥

বাংলা নাটক রচনার এই শ্লথ মন্থরতা ও বৈচিত্র্যহীনতা অতঃপর রামনারায়ণের দ্বারা অপসারিত হল। রামনারায়ণ তর্করত্নই সর্বপ্রথম বাংলা নাটককে জীবনমুখী করবার গৌরব লাভ করলেন। নাটক জীবনের দর্পণ, অবশ্য ব্যাপক অর্থে সাহিত্যের সংজ্ঞাই তাই। কিন্তু নাটকের ক্ষেত্রে একথা যতখানি গভীর, সাহিত্যের অন্যান্য রূপ প্রকাশের ক্ষেত্রে ঠিক ততখানি নয়। ভাবজীবন ও ব্যবহারিক জীবন—এই উভয়কে নিয়েই মানবজীবন পরিপূর্ণ ও সম্পূর্ণ। শুধু ভাবসমুন্নতিই জীবনের সবটা নয়। যে সংসার ও সমাজের পটভূমিকায় আমরা বাস করি, তাকে উপেক্ষা করে আমরা বাঁচতে পারি না। এই সংসার ও সমাজ জীবনের সঙ্গে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর যে দ্বন্দ্ব, তাকেই তুলে ধরা হয় নাটকে। এই দ্বন্দ্ব ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির অথবা সমাজ বিধির সঙ্গে ব্যক্তির জীবনাচরণের এমনকি একটা দুর্লঙ্ঘ্য শক্তি যাকে বলি নিয়তি, তার সঙ্গে ব্যক্তি বা সমষ্টির দ্বন্দ্বও অন্তর্ভুক্ত। আসলে এই ব্যক্তি চেতনাই যথার্থ নাটকের বৈশিষ্ট্য। ইস্‌কাইলাস (Æschylus—৫২৫-৪৫৬

খ্রীঃ পূঃ), সফোক্লিস (Sophocles—৪৯৫-৪০৬) খ্রীঃ পূঃ), এবং ইয়োরিপীডিস (Euripides—৪৮০-৪০৬ খ্রীঃ পূঃ)-এর ট্র্যাজেডিগুলিতে নিয়তির প্রাধান্য থাকলেও এই ব্যক্তি-চেতনাই এঁদের নাটকের মূল বৈশিষ্ট্য। পঞ্চদশ শতাব্দীর রেনেশাঁর মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ ইয়োরোপীয় সাহিত্যে এই মানবতার জয়-জয়কার। ব্যক্তি চেতনাকে অনুসরণ করেই সমাজ প্রবেশ করেছে কাব্য-নাটক ও গল্প-উপন্যাসে। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, যে সমাজ বৈচিত্র্যহীন ও প্রভাবশূন্য সেই সমাজে নাটকীয় উপাদান থাকতে পারে না। বাংলা সাহিত্যে নাটকের বিলম্বিত আবির্ভাবের মূলকারণও এখানে নিহিত। নিস্তরঙ্গ বাঙালী জীবনে উনিশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত নিছক ধর্মনির্ভর যাত্রাগান ও পাঁচালীর প্রাধান্য ছাড়া যথার্থ নাটকের সন্ধান আমরা পাই না। কথা ও গানের মাধ্যমে কিছু নির্দিষ্ট ধর্মকথা দর্শক-শ্রোতার সামনে অভিনয় করে তাদের নয়ন-মনকে তৃপ্ত করবার চেষ্টা করা হত। আর এর ফাঁকে ফাঁকে বৈচিত্র্যস্বরূপ কিছু হেঁয়ালি, ভাঁড়ামির সংযোজন থাকত। বদ্ধ জলাশয়ে মন্দ মন্দ বাত্যাবিক্ষেপে জলের বুকে যে মৃদু চাঞ্চল্য জাগে, বাঙালী জীবনের গণ্ডীবদ্ধতায় তেমনি কিছু কিছু সামাজিক দোষ-ত্রুটির হাস্যকর দিক অনুষ্ঠান বিশেষে দর্শকদের সামনে তুলে ধরা হত। যাত্রাগানের আসরই ছিল এই জাতীয় রং-সং, নক্সা প্রদর্শনের উপযুক্ত ক্ষেত্র।

কিন্তু জীবনে ঘটনার যে ঘনঘটা থাকলে সামাজিক নাটক রচনা করা যায়, তেমন ঘটনা মুখরতার অভাবেই বাংলা সাহিত্যে যথার্থ নাটকের আবির্ভাব বিলম্বিত হয়েছিল। তাই উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের আগে এমন প্রচেষ্টা দেখাই গেল না। রামনারায়ণ এই অভাব দূর করে নাটক রচনার একটা পথ দেখালেন। উমেশচন্দ্র মিত্র, মধুসূদন দত্ত এই ধারায় নাটক-প্রহসন রচনা করে এর পুষ্টির সহায়তা করলেন আর দীনবন্ধু তাঁর ব্যাপক অভিজ্ঞতা ও 'সর্বব্যাপিনী সহানুভূতির' সহযোগে বাংলা নাটকের একটি আদর্শ প্রস্তুত করেছিলেন। বঙ্কিমসুহৃদ্ দীনবন্ধু বঙ্কিমের মতই মানবপ্রীতির আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। "প্রীতি সংসারে সর্বব্যাপিনী—ঈশ্বরই প্রীতি। প্রীতিই আমার কর্ণে এক্ষণকার সংসারসঙ্গীত। অনন্তকাল সেই মহাসঙ্গীত সহিত মনুষ্য হৃদয়তন্ত্রী বাজিতে থাকুক। মনুষ্য জাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে, তবে আমি অন্যসুখ চাই না"—বঙ্কিমের এই কথা দীনবন্ধুর ক্ষেত্রেও সমভাবেই প্রযোজ্য। নাট্যসাহিত্যে দীনবন্ধুমিত্রের আবির্ভাবের পথ প্রস্তুত হয়েছিল রামনারায়ণ, উমেশচন্দ্র ও মধুসূদনের দ্বারা। তারও আগে যাত্রার আসরে চিত্ত বিনোদনের জন্য সামাজিক ত্রুটি-বিচ্যুতিকে নিয়ে প্রস্তুত নক্সা জাতীয় অভিনয়গুলির মাধ্যমেই ভাবীকালের সামাজিক নাটক রচনার বীজ অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সম্মুখে ব্যাপক সামাজিক আন্দোলনকে ছেড়ে দিয়ে উনিশ

শতকের প্রথমার্ধে বিদ্বৎজন পড়ে রইলেন শুধু সংস্কৃত নাটকের অনুবাদের মধ্যে। এর কারণ নির্ণয় খুব দুরূহ নয়। যে ব্যাপক সামাজিক অভিজ্ঞতা থাকলে সমাজ-সমস্যা অবলম্বনে নাটক রচনা করা যায়, তা একালের কোন নাট্যকারেরই ছিল না। তবু এই অভিজ্ঞতার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায় শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কুলীন-কুলসর্বস্ব-এর লেখকের মধ্যে।

সমাজ-সমস্যা নিয়ে গদ্য রচনা অনেক আগেই শুরু হয়েছিল। কাব্যে ঈশ্বর গুপ্ত সমাজ জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন। সংবাদ **প্রভাকরের** সম্পাদক হিসেবে সমাজ-সমস্যাও তিনি আলোচনা করেছেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবু বিলাস', 'নববিবিবিলাস', 'কলিকাতা কমলালয়' প্রভৃতি রচনায় সমকালীন জীবন-ভাবনার পরিচয় বিধৃত। বস্তুতঃ, উনিশ শতকের মাঝামাঝি সমাজ-সমস্যাগুলিকে নাটকাভিনয়ের মাধ্যমে জনসাধারণের সম্মুখে তুলে ধরবার প্রয়োজনীয়তা অনেকেই অনুভব করেছেন। কিন্তু এই সদিচ্ছার মূলে নাট্য-সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা আদৌ ছিল কিনা বুঝা যায় না।

রঙ্গপুরের জমিদার কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী ৫০ টাকা পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি জানিয়ে সাময়িক পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন যে, পতিব্রতার 'ধর্ম কর্ম পবিত্রতা চরিত্র চিহ্নাদি বিষয়ে' যিনি 'পতিব্রতোপাখ্যান' নামক গ্রন্থ রচনা করে দিতে পারবেন, তিনি ঐ পুরস্কার পাবেন। রামনারায়ণ তর্করত্ন 'পতিব্রতোপাখ্যান' (১৮৫৩) নামক গ্রন্থ রচনা করে ঐ পুরস্কার লাভ করেন। কালীচন্দ্র রায়-চৌধুরী এরপর আরেকটি বিজ্ঞাপনে জানালেন যে, "বল্লাল সেনীয় কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত থাকায় কুলীন কামিনীগণের এক্ষণে যে দুর্দশা ঘটিতেছে, তদ্বিষয়ে প্রস্তাব সম্বলিত 'কুলীন-কুলসর্বস্ব' নামে এক নবীন নাটক যিনি রচনা করিয়া রচকগণের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্টতা দর্শাইতে পারিবেন তিনি তাঁহাকে ৫০ টাকা পারিতোষিক দিবেন।" ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত রামনারায়ণের 'কুলীন-কুলসর্বস্ব', এই পুরস্কারের অধিকারী হয়েছিল।

রামনারায়ণের এই গ্রন্থ অভিনয়ের উদ্দেশ্যে রচিত নয়। এমনকি 'নাটক' আখ্যাত হলেও নাটকীয় ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রাচুর্যও এই রচনায় আছে। প্রকৃতপক্ষে 'কুলীন-কুলসর্বস্ব'কে সামাজিক নক্সা জাতীয় রচনা বলা যেতে পারে। কাহিনীর পরিচয় প্রসঙ্গে রামনারায়ণ ভূমিকায় বলেছেন,—

> "এই নাটক ছয় ভাগে বিভক্ত। প্রথমে, কুলপালক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যাগণের বিবাহানুষ্ঠান। দ্বিতীয়ে, ঘটকের কপট ব্যবহারসূচক রহস্যজনক নানা প্রস্তাব। তৃতীয়ে, কুলকামিনীগণের আচার-ব্যবহার। চতুর্থে, শুক্রবিক্রয়ীর দোষোদঘোষণ। পঞ্চমে, নানারহস্য ও বিরহী পঞ্চাননের বিয়োগ পরিবেদন।

ষষ্ঠে, বিবাহ-নির্বাহ। এই রীতিক্রমে এই নাটক রচিত হইয়াছে, ইহা কেবল রহস্যজনক ব্যাপারেই পরিপূর্ণ বটে, কিন্তু আদ্যোপান্ত সমস্ত পাঠ করিয়া তাৎপর্য গ্রহণ করিলে কৃত্রিম কৌলিন্য প্রথায় বঙ্গদেশের যে দুরবস্থা ঘটিয়াছে তাহা সম্যক্ অবগত হওয়া যাইতে পারে।"

'কুলীন কুলসর্বস্বের' কোন কোন ঘটনা সম্ভবতঃ রামনারায়ণের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফসল। নাটকটি প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে রচিত হলেও মনে হয় এই জাতীয় কোন রচনা লিখবার পরিকল্পনা তাঁর মনে আগে থেকেই ছিল। 'বিজ্ঞাপনে' তিনি বলেছেন, "পুরাকালে বল্লাল ভূপাল আবহমান প্রচলিত জাতি মর্য্যাদা মধ্যে স্বকপোল-কল্পিত কুল-মর্য্যাদা প্রচার করিয়া যান। তৎপ্রথায় অধুনা বঙ্গস্থলী যেরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন প্রস্তাব লিখিতে আমি নিতান্ত অভিলাষী ছিলাম।"

'কুলীন-কুলসর্বস্ব' নাটকটির বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ,—

১. এই নাটকের কাহিনীতে কোন নির্দিষ্ট ধারাবাহিকতা নেই, কতকগুলি খণ্ড বিচ্ছিন্ন দৃশ্যের মাধ্যমে বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে।

২. নির্দিষ্ট প্লটের অভাব। কৌলীন্যপ্রথার ক্ষীণসূত্রে বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলির সংযোজন করা হয়েছে মাত্র।

৩. নায়ক নায়িকা (প্রধান চরিত্র) চরিত্রের অভাব। অন্যান্য চরিত্রগুলি সংস্কৃত রূপক নাটকের মতো একএকটি গুণের প্রতীক। যেমন, কুলপালক, বিবাহ-বণিক, অধর্মরুচি, অমৃতাচার্য, উদর পরায়ণ ইত্যাদি।

৪ সংলাপে ঔচিত্যবোধের অভাব। তবে লঘু ও মেয়েলি সংলাপে নাট্যকার বেশ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

৫ রচনারীতি ও আঙ্গিক পরিকল্পনা সংস্কৃতানুসারী। প্রস্তাবনা, সূত্রধার ও নটীর কথোপকথন আছে; শেষে রয়েছে ইঙ্গিতপূর্ণ ভরতবাক্য।

৬. সংস্কৃত নাটকের রীতিতে স্থান বিশেষে বর্ণনা বাহুল্য।

—অর্থাৎ নাটকের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের অনেকগুলিই 'কুলীন-কুলসর্বস্বে' অনুপস্থিত। যে বিষয় নিয়ে রামনারায়ণ নাটক রচনা করেছেন, তার গুরুত্ব ও গভীরতা অনস্বীকার্য। কিন্তু শুধুমাত্র তথ্য নিয়েই নাটক রচনা করা যায় না, নাটকের চরিত্রগুলিকে জীবন্ত ও ও প্রাণপূর্ণ হয়ে উঠতে হয়। শুধু কথোপকথনের মাধ্যমে একটি জ্ঞাতব্য তথ্য ব্যক্ত হলেই তাকে নাটক আখ্যা দেওয়া যায় না। উমেশচন্দ্র মিত্র, মধুসূদন দত্ত এবং দীনবন্ধু মিত্রের সঙ্গে রামনারায়ণের এখানেই পার্থক্য। তবু যে একদা এই নাটক প্রভূত মঞ্চ-সাফল্য ও জনচিত্ত বিনোদনে সমর্থ হয়েছিল তার কারণ এই নয় যে, কুলীন-কুলসর্বস্ব একটি উৎকৃষ্ট

নাটক। রামনারায়ণই প্রথম নাট্যকার যিনি সমাজের একটি ঘৃণিত সমস্যাপূর্ণ কদাচারকে স্পষ্ট করে তুলে ধরতে পেরেছিলেন, যে সমস্যার বলি বাংলাদেশের অনেকেই। এখানেই তাঁর নাটকের জনপ্রিয়তার কারণ নিহিত আছে। রামনারায়ণ তাঁর নাটকের বক্তব্য অনুসারী কৌতুকরস ও যাত্রার ধরনের হেঁয়ালিপূর্ণ উক্তির দ্বারা রচনাকে রসাল করবার চেষ্টা করেছেন। 'কুলীন-কুলসর্বস্ব' নাটক হিসেবে যাই হোক, এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অসাধারণ। বাংলা নাটকে সমাজ সংস্কার আন্দোলনের অগ্রদূত এই নাটক। মধুসূদন ও দীনবন্ধু মিত্রকেও এই নাটক কিছু পরিমাণে অনুপ্রাণিত করেছিল বলে মনে হয়।

একথা সত্য যে, সমাজ সমস্যা নিয়ে নক্সা রচনা যতটা সহজ, নাটক রচনা ততটা সহজ নয়। ব্যাপক সামাজিক অভিজ্ঞতা ও সমাজ সম্পর্কে গভীর সহানুভূতি না থাকলে পূর্ণাঙ্গ সামাজিক নাটক রচনা করা যায় না। 'কুলীন-কুলসর্বস্ব' নাটক নয়, খাঁটি প্রহসনও একে বলা যায় না। একটি ঘৃণ্য সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে খণ্ডচিত্র হিসেবে এর যা কিছু মর্যাদা। রামনারায়ণ পরে আরও একটি সামাজিক নাটক রচনার প্রয়াস পেয়েছেন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত সেই 'নবনাটক' ও সার্থক সামাজিক নাটক হিসেবে উল্লেখযোগ্য নয়। 'কুলীন-কুলসর্বস্বের মতো এই নাটকও ফরমায়েসী রচনা। একই ধাঁচের নক্সা-চিত্র ছাড়া যথার্থ সামাজিক নাটক রচনার চেষ্টা তিনি করেননি। পাথুরিয়াঘাটা রঙ্গমঞ্চের জন্য লিখিত তাঁর তিনটি প্রহসন 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' (আনু : ১৮৬৫), 'উভয় সংকট' (১৮৭২) এবং 'চক্ষুদান' (১৮৬৯) ও তাই। রামনারায়ণের শিল্পীসত্তার মুক্তি সমাজ সমস্যা চিত্রণে নয়, পৌরাণিক ও সংস্কৃত নাটকের অনুবাদের ক্ষেত্রেই তাঁর যা কিছু কৃতিত্ব। মধুসূদন ও দীনবন্ধুর সমকালে নাটক রচনা করেও তিনি আগাগোড়া প্রাচীনপন্থী। অথচ, কলকাতার সখের থিয়েটারের আনুকূল্য তাঁর মত আর কোন নাট্যকারের ভাগ্যেই ঘটেনি। রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনানুরূপ নাটক রচনা করে তিনি 'নাটুকে রামনারায়ণ' হয়েছিলেন। একমাত্র 'কুলীন-কুলসর্বস্ব' ছাড়া তাঁর সবকটি নাটক-প্রহসনই রচিত হয়েছিল বিদ্বোৎসাহিনী, বেলগাছিয়া, পাথুরেঘাটা এবং জোড়াসাকোঁ রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনে।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত গৌরিভা (গরিফা) গ্রাম নিবাসী বৈদ্য নন্দকুমার রায়ের বাংলায় অনূদিত কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকখানি একসময় 'কুলীন-কুল সর্বস্বে'র মতই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। নন্দকুমার রায়ের এই "শকুন্তলা" নাটকখানি দিয়েই বাংলা নাটকের অভিনয়ধারার প্রবর্তন হয়। ১৮৫৭, ৩০শে জানুয়ারী আশুতোষ দেবের বাড়িতে অভিনীত এই নাটকটিই সম্ভবতঃ প্রথম মুদ্রিত নাটকের অভিনয়।

'শকুন্তলা' নাটকটির একাধিক সংস্করণই এর জনপ্রিয়তার প্রমাণ। অনুবাদ মূলানুগ

কিন্তু ভাষা কৃত্রিমতা বা জড়তাগ্রস্ত নয়। সংলাপ রচনায় নন্দকুমার সংস্কৃত রীত্যনুসারে ভদ্রজনের মুখে সাধুভাষা, স্ত্রীচরিত্রে মার্জিত চলিত ভাষা এবং ভদ্রেতর চরিত্রে লৌকিক চলিত ভাষা ব্যবহার করেছেন। স্থানীয় মৎস্যজীবীদের মুখের ভাষা আরোপ করেছেন ধীবরের সংলাপে। গদ্যসংলাপে নন্দকুমার অনেকটা স্বাভাবিকতা বজায় রাখতে পারলেও কালিদাসের সংস্কৃত কাব্য সংলাপগুলির পয়ার-ত্রিপদীতে রূপান্তর তত মনোগ্রাহী হয়নি। কালিদাসের নাটকের লালিত্য ও সৌন্দর্য ভাষান্তরে রক্ষা করা দুরূহ, নন্দকুমার এবিষয়ে অবহিত ছিলেন। প্রথম বারের বিজ্ঞাপনে তিনি বলেছেন,—

> "এই গ্রন্থ মহাকবি শ্রীকালিদাস বিরচিত, অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকের অনুরূপ অনুবাদ। মূল গ্রন্থ পাঠ করিলে যেরূপ অনির্ব্বচনীয় প্রীতি প্রাপ্ত হওয়া যায় এই বাঙ্গালা অনুবাদে সেইরূপ প্রীতির প্রত্যাশা করা অসম্ভব, কেননা, কোন গ্রন্থ, এক ভাষা হইতে অন্য ভাষায় ভাষান্তরিত হইলে তাহার লালিত্য ও মিষ্টতা সহজেই হ্রাস পায়। বিশেষতঃ শকুন্তল নাটক স্থানে স্থানে এরূপ দুরূহ যে তাহা সুচারুরূপে ভাষান্তর করা দুঃসাধ্য।"

এ-সত্ত্বেও পাঠক নাটকখানিকে সাদরে গ্রহণ করেছেন। নন্দকুমার এ-প্রসঙ্গে বলেছেন,—

> "১২৬২ অব্দে যখন আমি এই গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করি, তখন বঙ্গভাষায় পাঠোপযুক্ত কোন নাটক ছিল না, সুতরাং ইহা সকলে আগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ভাষা নাটক রচয়িতাদিগের পক্ষেও আদর্শ স্বরূপ হইয়াছিল এবং ইহাই অভিনয়োপযোগী বলিয়া সর্ব্বপ্রথমে কলিকাতা নিবাসী ৺আশুতোষবাবুর বাটীতে তৎপরে জনাই নিবাসী জমিদার মুখোপাধ্যায়দিগের ভবনে অভিনীত হয়।"[৬৬]

বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে বাংলাদেশে বিধবা বিবাহ আন্দোলন তীব্রতা লাভ করেছিল। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়ে গেল। এই প্রথার প্রবর্তনে দুস্তর বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল অশিক্ষিত জনসাধারণ ও গোঁড়া হিন্দুসমাজের সংস্কার বিমুখতা। সুতরাং বিধবা বিবাহের প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করে কিছু কিছু নাটক লেখা হয়েছিল এবছর থেকেই। উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা বিবাহ' এই ধারার প্রথম নাটক। এই প্রচেষ্টার বিরোধিতা করেও নাটক লিখবার চেষ্টা হয়েছে। কুলীন-কুলসর্বস্বের মত অত ব্যাপক না হলেও 'বিধবা বিবাহ' নাটক মঞ্চসাফল্য ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। ১৮৫৯ সনের ২৩শে এপ্রিল কেশব সেনের উদ্যোগে মেট্রোপলিটান থিয়েটারে এই নাটকের প্রথম অভিনয় হয়।

অল্পবয়স্কা যুবতী বিধবা কন্যা ঘরে থাকলে পরিণাম কী ভয়ংকর হতে পারে, 'বিধবা বিবাহ' নাটকের তাই বর্ণিতব্য বিষয়। নাটকটি বিষাদান্তক। উমেশচন্দ্র তাঁর নাটক সম্পর্কে বলেছেন, "the first attempt made to introduce the regular tragedy into Bengalee drama." নাট্যকারের এই দাবী অযৌক্তিক নয়। কেননা, প্রথম ট্র্যাজেডি 'কীর্তিবিলাস' নাটক হিসেবে নগণ্য, তাই 'বিধবা বিবাহ'কে প্রথম বাংলা ট্র্যাজেডি নাটকের মর্যাদা দিতে হয়।[৬৭]

নাটকটির ভাষা প্রধানতঃ কথ্যরীতি আশ্রয়ী, কিন্তু সংলাপের ভাষা স্থান বিশেষে পল্লবিত ও অলংকৃত হয়ে পড়েছে। সাধু ও কথ্যরীতির মিশ্রণ থেকে এই নাটক মুক্ত নয়। চরিত্র-চিত্রণের ক্ষেত্রে নাট্যকার স্বাভাবিকতা বজায় রাখতে পেরেছেন। নাটকটির পদ্যসংলাপাংশে ভারতচন্দ্রের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। নাটকীয় কাহিনীর ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ থাকলেও দীর্ঘ স্বগতোক্তি এবং মৃত্যুকালে নায়িকা স্থলোচনার দীর্ঘ খেদোক্তি নাটকীয়তাকে ক্ষুণ্ণ করেছে। তাছাড়া, বিধবা বিবাহের সমর্থনে পণ্ডিতগণের আলোচনা-দৃশ্য নাটকখানিকে উদ্দেশ্যমূলক নাটকের পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই প্রকৃতপক্ষে বাংলা নাটক রচনার প্রাচুর্য দেখা দিয়েছিল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত তিনটি রঙ্গমঞ্চ এবং ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বেলগাছিয়া মঞ্চসঙ্ঘ বাংলা নাটক রচনায় বঙ্গীয় লেখকগণকে উদ্বুদ্ধ করেছিল নিঃসন্দেহ। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চে রামনারায়ণের 'বেণী সংহার' নাটকের অভিনয়সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে কালীপ্রসন্ন সিংহ নাটক রচনায় উদ্বুদ্ধ হন। তাঁর 'বিক্রমোর্বশী' এবং 'সাবিত্রী সত্যবান' এই রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের উদ্দেশ্যেই রচিত। বাংলা নাট্য-জগতে দীনবন্ধুর আবির্ভাব ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৫৮ থেকে ১৮৬০ এই তিন বছরে প্রকাশিত নাটকের তালিকা নিম্নরূপ,—

১৮৫৮—কালীপ্রসন্ন সিংহ—সাবিত্রী-সত্যবান।
মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—চার ইয়ারের তীর্থযাত্রা।
রামনারায়ণ তর্করত্ন—রত্নাবলী নাটক।
যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর—বিদ্যাসুন্দর।
সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর—মুক্তাবলী নাটক।
তারকচন্দ্র চূড়ামণি—সপত্নী নাটক।
শ্রীনারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধি—কলিকৌতুক।
হরচন্দ্র ঘোষ—কৌরব বিয়োগ।

১৮৫৯—মধুসূদন দত্ত—শর্মিষ্ঠা নাটক।
উমাচরণ দে—নলদময়ন্তী নাটক।
কালিদাস শর্মা—মুক্তাবলী।
মণিমোহন সরকার—মহাশ্বেতা।
কালীপ্রসন্ন সিংহ—মালতী মাধব।
১৮৬০—সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর—মালবিকাগ্নিমিত্র।
রামনারায়ণ তর্করত্ন—অভিজ্ঞানশকুন্তলা।
মধুসূদন দত্ত—একেই কি বলে সভ্যতা ?
মধুসূদন দত্ত—বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ।
মধুসূদন দত্ত—পদ্মাবতী।
রামচন্দ্র দত্ত—বাল্যবিবাহ।
স্যামুয়েল পীরবক্স—বিধবা-বিরহ।
দীনবন্ধু মিত্র—নীলদর্পণং নাটকং।
যদুনাথ মিত্র—বিশ্ববিনোদ।
শ্যামাচরণ শ্রীমাণি—বাল্যোদ্বাহ নাটক।

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বাংলা মৌলিক নাটক প্রকাশিত হবার পর এবং দীনবন্ধুর আত্মপ্রকাশের মধ্যে যে কয়টি নাটক রচিত হয়েছে শ্রেণীগত বিচারে তার অধিকাংশই সমাজ-সমস্যামূলক। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে রামনারায়ণের 'কুলীন-কুলসর্বস্ব' এই ধারার উৎসকে উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। একই সঙ্গে স্মরণীয়, এবছরই প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' উপন্যাসের প্রকাশ। সমাজ-সমস্যাকে অবলম্বন করে এই গ্রন্থেই প্রথম বাংলা উপন্যাস রচনার সূত্রপাত। উক্ত দুটি গ্রন্থের একই বছরে প্রকাশ তাৎপর্যপূর্ণ। তখন থেকেই বাংলা সাহিত্যে 'সমাজ' বিষয়ক রচনার অপেক্ষাকৃত ব্যাপকতা লক্ষ্য করা গেল।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩১-শে জুলাই রামনারায়ণের 'রত্নাবলী' দিয়ে বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চের দ্বারোদ্ঘাটন হল। এই রঙ্গমঞ্চে 'রত্নাবলীর' ছ'সাতবার অভিনয় হয়। নিমন্ত্রিত ইয়োরোপীয় দর্শকগণের জন্য রত্নাবলীর ইংরেজী অনুবাদের সূত্রে মধুসূদন এই রঙ্গমঞ্চের উদ্যোক্তাগণের সঙ্গে পরিচিত হলেন। রত্নাবলীর মত এমন একটি অনাটকীয় অভিনয়ে রাজারা প্রভূত অর্থব্যয় করছেন দেখে যথার্থ নাটক রচনায় মধুসূদন অনুপ্রাণিত হলেন। বেলগাছিয়ায় রত্নাবলীর অভিনয় ও সেই সূত্রে মধুসূদনের বাংলা নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে আবির্ভাব বহুশ্রুত ঘটনা। বস্তুতঃ, শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯) রচনার দ্বারা বাংলা নাটকের আঙ্গিক পরিকল্পনার আদর্শ স্থিরিকৃত হয়েছিল। এতাবৎকাল ইংরেজী ও সংস্কৃতের আদর্শ অনুসরণ সম্পর্কে নাট্যকার-

গণের মনে যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল, অতঃপর তা দূরীভূত হতে পেরেছিল। মধুসূদনই মূলতঃ এসত্য স্পষ্টভাবে নিরূপণ করলেন যে, সংস্কৃত নয়, ইংরেজী ; বিশেষতঃ, শেক্সপীয়রীয় রীতিই বাংলা নাটকের গ্রহণীয় আদর্শ।[৬৮] শর্মিষ্ঠার নাট্য-কাহিনী পৌরাণিক শর্মিষ্ঠা-যযাতি-দেবযানী-বিষয়ক। মহাভারতের আদিপর্বের যযাতি উপাখ্যানটিকে মধুসূদন প্রয়োজনমত পরিবর্তন করে নিয়েছেন।

'শর্মিষ্ঠা' রচনাকালে মধুসূদন গৌরদাস বসাককে যে চিঠি লিখেছিলেন, তাতে সংস্কৃত আনুগত্য অস্বীকার করবার মনোভাব দৃঢ়ভাবেই ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু শর্মিষ্ঠা নাটকে তিনি এই প্রভাব সর্বাংশে কাটিয়ে উঠতে পারেননি। 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের বৈশিষ্ট্যগুলি মোটামুটি নিম্নরূপ,—

১. এই নাটকেই সর্বপ্রথম একটি সুপরিকল্পিত সুসংবদ্ধ প্লট পাওয়া গেল। এই নাটকের আগে 'নাটক' আখ্যাত রচনাগুলিতে এমন দৃঢ়পিনদ্ধ প্লট আমরা পাইনি।

২. প্লট সুসংবদ্ধ হলেও কাহিনীর গতিমন্থরতা এই নাটকের প্রধান দোষ। এই গতিমন্থরতার প্রধান কারণ,

ক) নাটকে নাটকীয় (dramatic) ভাবের অভাব।

খ) ঘটনা-কাহিনী প্রায়শঃই অন্য চরিত্রের মুখে ব্যক্ত হয়েছে, ফলে নাটকের action বাধাগ্রস্ত হয়েছে।

গ) সংলাপের ভাষায় ক্রিয়াপদের কথ্যরূপ থাকলেও তৎসম শব্দের বাহুল্য এবং সংস্কৃত রীতির বাক্‌ভঙ্গি নাটকের ভাষাকে গতিহীন ও দুরূহ করে তুলেছে। সংস্কৃত পদ্ধতির অলংকার ব্যবহার মধুসূদনের গদ্যে যথোপযুক্ত হয়নি।

ঘ) নাটকের অনেক ক্ষেত্রে অতি দীর্ঘ স্বগতোক্তি অত্যন্ত ক্লান্তিকর বলে মনে হয়। স্বগতোক্তির মাধ্যমে কবিত্ব-সৃষ্টির প্রচেষ্টা নাটকীয়তাকে ক্ষুণ্ণ করেছে।

৩. 'শর্মিষ্ঠা' নাটকে সংস্কৃত নাটকের মত বিদূষক চরিত্র আছে যা শকুন্তলার মাধব্যের আদর্শেই অঙ্কিত বলে মনে হয়। এই চরিত্রটির দ্বারা কৌতুক সৃষ্টির চেষ্টা সর্বাংশে সাফল্য লাভ করেনি।

৪. 'শর্মিষ্ঠা' আগাগোড়া গদ্যে লেখা হলেও রাজার উক্তিতে একবার পয়ার ব্যবহৃত হয়েছে।

৫. প্রচলিত যাত্রার আদর্শে কয়েকটি গানও এই নাটকে সংযোজিত হয়েছে।

৬. 'শর্মিষ্ঠা' পাশ্চাত্য রীতি অনুযায়ী পাঁচটি অঙ্ক ও কয়েকটি গর্ভাঙ্কে (দৃশ্যে) বিভক্ত হয়েছে।

এই নাটকের ত্রুটি-বিচ্যুতির তালিকা খুব ছোট নয় সত্য, কিন্তু শর্মিষ্ঠা নাটকের

সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এইখানে যে, এই নাটকই সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে বন্দীত্ব থেকে বাংলা নাটককে ভবিষ্যৎ-মুক্তির পথ-প্রদর্শন করেছিল।

'শর্মিষ্ঠা' রচনার কয়েকমাস পরেই সমাজ জীবনকে আশ্রয় করে মধুসূদন রচনা করলেন দুটি প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা ?' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'। প্রহসন দুটি বাঙালী সমাজের দুটি স্তরের পরিচয়বাহী। 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় মধুসূদন মোহগ্রস্ত নব্যযুগ সম্প্রদায়ের উন্মাদনাকে সরস ও জীবন্ত করে তুলে ধরেছেন। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' ধর্মধ্বজী বৃদ্ধের কপটতা ও লাম্পট্যের কৌতুকপূর্ণ বর্ণনায় সমৃদ্ধ। আশ্চর্য দক্ষতা দেখিয়েছেন নাট্যকার এদুটি প্রহসনে। যদি পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনার ইচ্ছা মধুসূদনের থাকত তাহলে বাংলা সামাজিক নাটকের আদর্শ হতে পারত এই রচনাদুটি। কিন্তু মধুসূদন প্রহসন দুটিতে সমাজ-সমস্যার দুটি দিকের নক্সা-চিত্র রচনা করেছেন মাত্র।

মধুসূদন যে দুটি বিষয়ে প্রহসন রচনা করেছেন সেই দুই বিষয়ে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল নিশ্চয়ই। 'একেই কি বলে সভ্যতা'র সমাজভুক্ত তিনি নিজেই। কিন্তু মাত্র দুটি প্রহসন ছাড়া মধুসূদন যুগ ও জীবন অবলম্বনে সামাজিক নাটক রচনায় হস্তক্ষেপ করেন-নি। মধুসূদনের প্রতিভার একটি অনন্যসাধারণ বিশিষ্টতা ছিল। গতানুগতিকতায় তিনি আকৃষ্ট হননি। নতুন ভাব নতুন আদর্শ সৃষ্টিতেই তাঁর আনন্দ ছিল বেশী। স্বল্পকালের সাহিত্য জীবনে মধুসূদন বাংলাসাহিত্যের নব নব দ্বারোদ্ঘাটনের অদ্বিতীয় পরিচয় রেখে গিয়েছেন। সৃষ্টির বৈচিত্র্যই মধুসূদনের প্রতিভার বড় পরিচয়। একই ধারায় দীর্ঘকাল অবস্থান করা তাঁর স্বভাবের প্রতিকূল ছিল। মধুসূদন তাই 'ঝড়ের পাখী।'

নাট্যসাহিত্যে দীনবন্ধুর আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত অনেকগুলি সামাজিক নাটক-প্রহসন, নক্সা প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলা নাটকের বিবর্তনে এদের ভূমিকা নগণ্য। সমাজ-সমস্যার বিভিন্ন দিক যেমন, বহু-বিবাহ, বাল্য-বিবাহ, বিধবা বিবাহ, দুশ্চরিত্রতা প্রভৃতি এই নাটকগুলির অবলম্বনীয় বিষয়। এই রচনাগুলির স্বতন্ত্র আলোচনা এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক। তাই এদের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করাই যথেষ্ট মনে করি। রচনাগুলির বৈশিষ্ট্য হল,—

১. বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব থাকলেও নাটকগুলির শিল্পরীতি ও রচনাভঙ্গি প্রাচীনপন্থী।

ক) অধিকাংশ নাটকের প্রারম্ভেই নান্দী, সূত্রধার-নটী প্রসঙ্গ আছে।

খ) অঙ্ক বিভাগ সংস্কৃতানুগ।

গ) সংলাপে আলংকারিক ভাষা ব্যবহার ও উচ্ছ্বাস-প্রবণতা সংস্কৃত রীতিরই অনুসারী।

২. সমস্যার গভীরতা ও বিষাদময়তা দেখানোর উদ্দেশ্যে অনেকগুলি নাটকের পরিণতিকে বিষাদান্তক করা হয়েছে।

৩. অধিকাংশ ক্ষেত্রে নাটকগুলির পটভূমি বাংলার পল্লী অঞ্চল।

৪. এই নাটকগুলির আরেকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল, এই নাটকগুলিতে গম্ভীর রস (বিষাদ-করুণ) অপেক্ষা লঘু-তরল হাস্যরস অনেক স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ।

আসলে সমকালীন সমাজ-সমস্যাকে অবলম্বন করে এই নাট্যকারগণ লেখনী ধারণ করেছিলেন, কিন্তু যথার্থ নাট্য-প্রতিভার অভাবে এঁদের রচনাগুলি নক্সার গণ্ডীতেই আবদ্ধ থেকেছে। তবে একথা ঠিক যে, অপটু হাতে লেখনী ধারণ করে তাঁরা যেমন সংস্কার-মনস্কতার পরিচয় দিয়েছিলেন তেমনি এঁদের এই নিরলস নাট্যচর্চার ধারা অবলম্বন করেই বাংলা সাহিত্যে যথার্থ সামাজিক নাটকের আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিল নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের হাতে।

মধুসূদনের চেয়ে ছ'বছরের বয়ঃকনিষ্ঠ, বাংলা সাহিত্য চর্চায় প্রায় সহগামী দীনবন্ধুর মধ্যে মধুসূদনের মত ব্যাপকতা ছিল না, একথা সত্য। কিন্তু গভীরতা ছিল না, একথা বলা যায় না। কৃষ্ণকুমারী, মেঘনাদবধ, বীরাঙ্গনা প্রভৃতি থেকে মধুসূদনকে যেমন পৃথক করে ভাবা যায় না, দীনবন্ধুকেও তাঁর নীলদর্পণ, সধবার একাদশী, লীলাবতী প্রভৃতি থেকে আলাদা করে দেখা যায় না। রাবণ ও মেঘনাদের প্রতি মধুসূদনের গভীর আন্তরিকতা ও সহানুভূতির সঙ্গে তুলনা করা যায় তোরাপ, রাইচরণ, নিমচাঁদ, নদেরচাঁদের প্রতি দীনবন্ধুর গভীর ও আন্তরিক সহানুভূতির।

তবু, মধুসূদনের বিরাট ব্যাপ্ত গাম্ভীর্য ও উত্তুঙ্গতার সঙ্গে দীনবন্ধুর খুববেশী তুলনা হয় না। তুলনা যে ক্ষেত্রে হয়, সে ক্ষেত্র হল মানবপ্রীতির। উনিশ শতকের নবজাগরণের মূলসুর হল মানবতাবাদ। এই মানবতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ মধুসূদন তাঁর কাব্যে দেবতা নয়, মানবেরই জয়গান করেছেন। মানবচিত্তের অন্তর্রহস্যের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করেছেন তিনি। দীনবন্ধুর নাটকের বিষয়ও ভালোয়-মন্দে মেশা এই পার্থিব মানুষ। এই মানুষের হীনতা, ব্যর্থতা এবং শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ত্বকে তিনি তাঁর নাটকে রূপায়িত করেছেন। সমাজ-সমস্যা নিয়ে নাটক রচনা করলে তা কমবেশী উদ্দেশ্যমূলক হবেই। তবে উদ্দেশ্যমূলকতা ও যথার্থ্য সাহিত্য রচনা একই বস্তু নয়। মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য রচনার উদ্দেশ্য কাব্যের জোয়ারে ভেসে গেছে। সমকালীন বাংলার জনজীবনের বিক্ষোভ ও হতাশা এবং ব্যভিচার নিয়ে দীনবন্ধু নাটক রচনা করেছেন কিন্তু উদ্দেশ্যমূলকতার সীমিত গণ্ডিতেই তাঁর নাটক আবদ্ধ থাকেনি। উদ্দেশ্যমূলকতার সীমা ছাড়িয়ে শাশ্বত সাহিত্যের রসলোকেই এদের স্থান হয়েছে, আজ একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই।

সূত্র-নির্দেশিকা

১. Foreword to 'কাল্পনিক সংবদল' : শ্রীমদনমোহন গোস্বামী সম্পাদিত, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, ১৯৬৩।

২. "Masquerades were a very common means of amusement in the old days ; dominoes were advertised for hire, also various female customs for gentlemen and evidently the fun raged fast and furious."

—*Echoes from old Calcutta*—H. E. Busteed, 1888। পৃ. ১৩৮।

৩. বাঙালী সংস্কৃতি ও লেবেডেফ : অরুণ সান্যাল, ১৩৭৯ ; পৃ. ৮৩।

৪. *Calcutta Stage* : some chapters from its Early History, Statesman : 22nd October, 1905.

৫. কলকাতায় বিদেশী রঙ্গালয় : অমল মিত্র ; পৃ. ৫।

৬. "The first building that was devoted to theatricals was situated behind the present writers' Building in Dalhousie Squire."

—*The good old days of John Company* : W. H. Carey, 1906 ; P. 131.

৭. "The Play House referred to was one which stood in the block called 'New China Bazar' behind (north of) Writers' Building."

—*Echoes from old Calcutta* : H. E. Busteed ; P. 122.

৮. "It was built by subscription shares of Rs. 100 each and cost a lakh."

—*Statesman*, 22nd October ; 1905.

৯. "It is very neatly fitted up, and the scenery and decorations quite equal to what could be expected here."

—*Original Letters from India* : Mrs Eliza Fay, 1908.

Letter, Dated 26th March ; 1781.

১০. "…Equals the most splendid European exhibitions."

—*Hartly House Calcutta* : Miss S. Goldborne ; 1789.

১১. বক্স—১ সোনার মোহর। পিট—৮ সিক্কা টাকা।

১২. *In the Day of the Company* : D. Dwers.

১৩. ক্যালকাটা থিয়েটারে অভিনীত 'Venice Preserved' নাটকটি দেখে মিঃ কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে ১৭৮১ সনের ২৬শে মার্চ তাঁর চিঠিতে লেখেন,—

"The parts are entirely represented by amateurs in the drama no hired persons being allowed to act. I assure you I have seldom characters supported in a manner that would not disgrace a European stage."

১৪. "Mrs. John Bristow had the honour of being the first Calcutta who brought lady actors into fashion."

—*Echoes from old Calcutta* : H. E. Busteed ; P. 139.

১৫. "Mrs Bristow went to England in January, 1790 and long Calcutta refused to be comforted "—Ibid.

১৬. লেবেডেফের নামের প্রকৃত উচ্চারণ বিষয়ে মতানৈক্য আছে। ডঃ সুকুমার সেন তাঁর "বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস" ২য় খণ্ড, ৩৭ পৃষ্ঠায় নামটি 'হেরাসিম' লেবেডে (Gerasim* S. Lebedeff) লিখেছেন। পাদটীকায় মন্তব্য করেছেন,* = Hera G অক্ষরের ধ্বনি এখানে হ-কারের মত। কিন্তু লেবেডেফ গবেষক ডঃ অরুণ সান্যা তাঁর 'বাঙালী সংস্কৃতি ও লেবেডেফ' গ্রন্থের পরিশিষ্ট অধ্যায়ের প্রথম পৃষ্ঠার পাদটী একটি নির্ভরযোগ্য তথ্য পরিবেশন করে বলেছেন,—

"লেবেডেফের প্রকৃত নাম গেরাসিম স্টেপানোভিচ লেবেডেফ। কেউ কেউ 'গেরা এর পরিবর্তে 'হেরাসিম' শব্দটি ব্যবহার করায় শব্দটি সঠিক প্রয়োগ সম্পর্কে জানার কলিকাতাস্থ রুশ দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করি। দূতাবাসের বর্তমান রুশ প্রতি বলেন, নামটি হওয়া উচিত 'গেরাসিম', 'হেরাসিম' নয়।"

১৭. Herasim Lebedev who one of the most remarkable per alities who flourished in the 18th-19th centuries, and he forms important link in the early history of Indological studies in Euro and the part he played in seeking to bring about an understand between India on the one hand and Russia and Europe on the has so long remained unknown and unappreciated."—Dr. S. Chatterjee.

—Foreword to *A grammar of the pure and mixed East In Dialects* by Herasim Lebedeff ; 1963.

১৮. *Lebedeff's Autobiography* ; P. 11.

১৯. বাঙালী সংস্কৃতি ও লেবেডেফ—ডঃ অরুণ সান্যাল : পৃ. ১২।

২০. "...then I candidly submitted my labour to some of the distinguished pundits, namely to Jogon-mohan-bidde, Ponchanan Bhattacharjo ; to Jogonnat Tarko, and to other learned pundits, who to my entire satisfaction, applauded my zeal in disclosing an object hitherto unknown to European."

—*Introduction to A Grammar of the pure and Mixed East India Dialects (1801)*.

২১. "লেবেডেফের হিন্দী ব্যাকরণ হইতে বোঝা যায় যে, বাঙ্গালার মত ভাষাতেও তাঁহার দখল ভালো হয় নাই, এবং তাঁহার সংস্কৃত জ্ঞান আরও কম ছিল। হয়তো কারণেই তাঁহার স্পষ্ট বিরাগ ছিল সার উইলিয়ম জোনস্ ও অন্যান্য বিদেশী পণ্ডিত যাঁহারা ভারতীয় ভাষাচর্চা করিতেছিলেন তাঁহাদের প্রতি। জন ফার্গুসনের হিন্দুস্থানী ব্যাকরণের বিরুদ্ধে কটাক্ষ যথেষ্ট আছে।"

—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ; ২য় খণ্ড : ডঃ সুকুমার সেন ; পৃ. ৩৮ পাদটীকা।

২২. *Introduction to A Grammar of the etc* :—G. S Lebedeff.

২৩. দ্রষ্টব্য ; ছদ্মবেশ : ডঃ শিশিরকুমার দাস, গন্ধর্ব, চতুর্থ বর্ষ ; ১৩৬২।

২৪. ক) কাল্পনিক সংবদল : পরিচয় শ্রীমদনমোহন গোস্বামী ; পৃ. ১৩।

খ) In the original, the scenes are laid out in Spain ; but in the translation, the scenes are changed to this country ;—the places spoken of instead of being Madrid and Seville, are Calcutta and Becknow ; and the Names of the persons in the Drama, are changed from European Names, to proper Names of this country."

—*Calcutta Review* ; 1923.

২৫. কাল্পনিক সংবদল : শ্রীমদনমোহন গোস্বামী ; পরিচয়, পৃ. ১৩।

২৬. *Doctor Love* (Love is the Best Doctor) ; *a comedy in three acts* by Moliere : Translated by Barrett H. Clark, London 1915.

২৭. *Introduction to a Grammar of the etc.*—G. S. Lebedeff

২৮. বাঙালী সংস্কৃতি ও লেবেডেফ : ডঃ অরুণ সান্যাল পৃ-১৭৩।

২৯. বাংলা প্রথম নাটক : ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত ; কথাসাহিত্য, ৩য় সংখ্যা : পৌষ, ১৩৬৮।

৩০. তদেব।

৩১. বাঙালী সংস্কৃতি ও লেবেডেফ : ডঃ অরুণ সান্যাল ; পৃ. ১৭৫।

৩২. কাল্পনিক সংবদল : শ্রীমদনমোহন গোস্বামী ; পরিচয় পৃ. ১৪-১৫।

৩৩. তদেব। পৃ. ১৫।

৩৪. বাংলা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ : মন্মথমোহন বসু ; পৃ. ৯১।

৩৫. তদেব। পৃ. ৯৩-৯৪।

৩৬. ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ ও বাংলা সাহিত্য : ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃ. ৪৫৭।

৩৭. "After the approbation of the Pondits—Golocknat-dash my Linguist, made me a proposal, that if I chose to present this play publicly, he would engage to supply me with actors of both sexes from among the natures : with wich idea I was exceedingly pleased.—I therefore, to being to view any undertaking, for the benefit of the European public without delay, sollicited the Governor-General—Sir John Shore, (now Lord Teignmouth) for a regular licence, who granted it me without hesitation."

—Herasim Lebedeff : *Introduction to a Grammar of the ect.*

৩৮. "...the first and second representation, both of which attracted an overflowing house."

—*Introduction to A Grammar of the etc.*

৩৯. "পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে দুইদিন গেরাসিমের নাটকটি জনগণ কর্তৃক বিপুলভাবে অভিনন্দিত হওয়াতে অতঃপর অভিনয়ের জন্য (মূল ও অনুবাদ উভয়) অনুমতি পাওয়া গেল। কিন্তু প্রতিপক্ষ এইবার ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন। কোম্পানীর রঙ্গালয়ের দৃশ্য-পটশিল্পী জোসেফ-ব্যাটল্ এই চক্রান্তের মূল নায়ক হইয়া গেরাসিমের দলে যোগদান করিল এবং তাহারই কুমন্ত্রণায় গেরাসিমের অভিনেতৃসঙ্ঘ একে একে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। উপযুক্ত চুক্তিপত্র থাকা সত্ত্বেও যখন তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনা গেল না তখন গেরাসিম সুবিচারের আশায় ধর্মাধিকরণের শরণ লইলেন। কিন্তু এখানেও তিনি ব্যর্থ হইলেন, টমাস রোওয়ার্থের যোগসাজসে কোন ব্যবহারজীবীই তাঁহার পক্ষ

সমর্থন করিল না। ফলে গেরাসিমের দল ভাঙ্গিয়া গেল রঙ্গালয়ের আসবাব পত্র জলের দামে বিক্রয় হইয়া গেল। ১৭৯৭ সালের মে মাসে এই ঘটনা ঘটে। গেরাসিমের এটি দুর্ভাগ্যের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী কোম্পানীর অমানবোচিত জঘন্য ঈর্ষা, বঙ্গদেশীয় কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কোন স্বার্থ ইহার সহিত জড়িত ছিল না।"

—কাল্পনিক সংবদল ; পরিচয়, শ্রীমদনমোহন গোস্বামী ; পৃ. ৬-৭।

৪০. লেবেডেফ চর্চার নূতন পর্ব : ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাসগুপ্ত, দেশ ২রা অগ্রহায়ণ ; ১৩৬৮।

৪১. "সাঁ সুসির প্রতিষ্ঠার আরও পূর্বে চৌরঙ্গী থিয়েটার নামক একটি থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু তাহাতে সাধারণ বাঙ্গালী দর্শকের বড় যাতায়াত ছিল না। দ্বারকানাথ ঠাকুরের ন্যায় দু'একজন সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী মাত্র তথায় কখন কখন উপস্থিত থাকিতেন।"

—মাইকেল মধুসূদনের জীবনচরিত : যোগীন্দ্রনাথ বসু।

৪২. "তখনকার যাত্রা গাওনা হইতে এই অভিনয়ের নিশ্চয়ই কিছু বিশেষত্ব ছিল, নতুবা ইহার বিবরণ সংবাদপত্রের পৃষ্ঠে উঠিত না।"—বিশ্বকোষ : ১৬শ খণ্ড ; পৃ. ১৭১।

৪৩. "কাপ্তেন সাহেব ইংরাজী সাহিত্য শাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। সেক্সপীয়ার তিনি যেমন পাঠ করিতেন ও বুঝাইতেন, এমন আর কাহাকেও দেখি নাই। মেকলে সাহেব তাঁহার সেক্সপীয়ার আবৃত্তি শুনিয়া বলিয়াছিলেন, 'I can forget everything of India but not your reading of Shakespeare.' তিনি আশ্চর্যরূপে সেক্সপীয়ার বুঝাইয়া দিতেন।···তিনি আমাদিগকে নাট্যালয়ে সর্বদা যাইতে বলিতেন। তাঁহার বাটীতে দেখা করিতে গেলে তিনি বলিতেন, 'Are you going to the theatre today ?' তাঁহার এই বিশ্বাস ছিল যে, কবিতা আবৃত্তি-বিদ্যা শিখিবার প্রধান স্কুল নাট্যালয়।"

—আত্মচরিত : রাজনারায়ণ বসু।

৪৪. *Asiatic Journal* Vol-XIV, July-December, 1822 থেকে 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' গ্রন্থে (পৃ. ৭-৮) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত অনুবাদ।

৪৫. বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃ. ১২।

৪৬. দ্রষ্টব্য—ঐ পৃ. ১৩।

৪৭. দ্রষ্টব্য—ঐ পৃ. ১৪-১৫।

৪৮. বিশ্বকোষ : রঙ্গালয় (বঙ্গীয়) পৃ. ১৭২ ; ১৬শ খণ্ড।

৪৯. দ্রষ্টব্য-বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস ; পৃ. ১৫-১৬।

৫০. বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস ; পৃ. ১৬।

৫১. "The first Project of the kind was contemplated by the late Hon'ble Baboo Prosono Coomar Tagore. The next attempt of the kind was made by Baboo Nobin Chunder Bose of Shambazar···The third attempet of the kind was made by the late Baboo Nagendra Nauth Tagore. The was very successful in his attempet."

—*The National paper* : Ed. by Nobogopal Mitra ; 1872, 11 December.

৫২. বিশ্বকোষ : রঙ্গালয় (বঙ্গীয়)। ১৬ খণ্ড, পৃ. ১৭৩।

৫৩. সংবাদ প্রভাকর, ২১শে অগস্ট, ১৮৪৮।

৫৪. বেঙ্গল হরকরা, ১৯শে অগস্ট, ১৮৪৮।

৫৫. ইংলিশম্যান, ১৯শে অগস্ট, ১৮৪৮।

৫৬. ঐ ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৮৪৮।

৫৭. কলকাতায় বিদেশী রঙ্গালয় : অমল মিত্র ; পৃ. ২১২।

৫৮. "In the absence of original Bengali plays they proceeded, influenced as they were by the charm of the English performances, to meet their want by enacting plays in English. But it hardly satisfied the 'dramatic appetite' of the general public, for it was all Greek to them. They had already imbibed an inordinate taste for the theatrical amusements and naturally looked forward to being entertained by appropriate plays written in their own Language."

—*The Bengali Theatre* : S. P. Mukherjee ; Calcutta Review (1924).

৫৯. হিন্দু পেট্রিয়ট ; ১১ই মে, ১৮৫৪।

৬০. ঐ —২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৫৫।

৬১. বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; পৃ. ২৩।

৬২. বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা : ডঃ সুকুমার সেন ; পৃ. ১৮৪।

৬৩. পুরাতন বাংলা নাটক সংকলন : ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। ভূমিকা, পৃ. ট-ঠ।

৬৪. অধুনা 'বাবু নাটক' দুষ্প্রাপ্য। ১৮৫৫ সালের ১৪ই ডিসেম্বর প্রকাশিত 'সংবাদ প্রভাকরের' একটি বিবরণে কালীপ্রসন্ন জানিয়েছেন,—

"পূর্বে প্রায় দুই বৎসর গত হইল আমি একবার বাবু নাটক নামক গ্রন্থ রচিয়া প্রকাশ করি কিন্তু তাহা এক্ষণে এমত পুনরায় দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে যে, কত লোক চারি মুদ্রা স্বীকার করিয়াও পান নাই, অতএব আমি পুনরায় মুদ্রিত করিবার অভিলাষি, যদ্যপি কেহ গ্রাহক শ্রেণীতে ভুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি বিদ্যোৎসাহিনী সভায় নামধাম লিখিয়া পাঠাইলে তাঁহাকে গ্রাহকগণ মধ্যে গণ্য করা যাইবেক, মূল্য ।৵০, বিনা স্বাক্ষরকারী ৸০ আনা মাত্র।" নাটকটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল কিনা, জানা যায় না। সুতরাং বাংলা নাটকের বিবর্তনে 'বাবু নাটকের' ভূমিকা কি ছিল তাও বলা অসম্ভব।

৬৫. বাংলা নাটকের ইতিহাস : ডঃ অজিতকুমার ঘোষ ; পৃ. ৪১।

৬৬. দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন : অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটক, ১৮৮২ ইং ; ১২৮৯ সাল।

৬৭. "বিধবা বিবাহ নাটকের পূর্বে একটিমাত্র মরণান্তিক নাটক লেখা হইয়াছিল—কীর্তিবিলাস। কীর্তিবিলাস নাট্যরচনা হিসাবে কিছুই নয় এবং বইটির প্রচারও হয় নাই। সুতরাং বাঙ্গালায় ট্রাজিক নাটক আসলে 'বিধবা বিবাহ।' সুলোচনার আত্মহত্যার মতো মর্মান্তিক পরিণতি সেকালের নাটকগুলির মধ্যে মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী ছাড়া অন্যত্র পাই না। কিন্তু কৃষ্ণকুমারীর আত্মলোপ এতটা ট্রাজিক নয়।"

—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ; ২য় খণ্ড : ডাঃ সুকুমার সেন ; পৃ. ৬১।

৬৮. "...Remember that I am writing for that portion of my countrymen who think as I think, whose minds have been more or less imbued with western ideas and modes of thinking ; and that it is my intention to throw off the fetters forged for us by a servile admiration of everything sanskrit".

পত্র সংখ্যা—৫২। কবিমধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী : ডঃ ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত পৃ. ১২৩-১২৪।